একটি সেমেটিক ধর্ম

ও

তার সমীক্ষা

চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকঃ
সুশীলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
হুগলী

মুদ্রণঃ
রাধাকৃষ্ণ প্রেস, বর্ধমান

নতুন সংস্করণঃ
অক্ষয় তৃতীয়া
৭ বৈশাখ, ১৪২২ (২১ এপ্রিল, ২০১৫)

যে বইটি বিনা প্রচারে সারা দেশে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। নির্মম সত্য চমকিত করেছে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের। যারা সব ধর্মকে সমান ভেবে চিন্তার জগতে অন্ধকূপে বন্দী; তাদের জন্য এবই অবশ্য পাঠ্য।

মূল্যঃ ১২ টাকা

Paper size: A5 (14.8 x 21 cm)

একটি সেমেটিক ধর্ম ও তার সমীক্ষা

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষ বহু সাধনা, বহু অধ্যবসায়ের ফলে গড়ে তুলেছে মনুষ্য সভ্যতা। এই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে অনেক ত্যাগ, অনেক রক্ত ঝরেছে। তাই আমরা আর কোন ভাবেই সেই আদিমকালের সেই বর্বরতার অসভ্যতার যুগে ফিরে যেতে চাই না। আজকের মানুষ চাইছে বিশ্বব্যাপী সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতা, চাইছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব। যুদ্ধ নয়, বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে গড়ে তুলতে চায় প্রেম প্রীতি-শান্তি। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষের আচরণ, তাদের দর্শন এই মনুষ্যত্বের অন্তরায় হয়ে উঠেছে। ধর্মের গোঁড়ামী অসহিষ্ণুতা তাদের নৈতিক আচরণকে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ পঙ্কিলতার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখছে। হারিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যক্তিজীবন থেকে মানুষ নামের সংজ্ঞা। পরমতের প্রতি বিদ্বেষ, তীব্র ঘৃণা তাদের সমাজকে পশুত্ব ও বর্বরতার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই বর্বরতা, অমানবতা, পরধর্মবিদ্বেষী, সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরাচারী অশুভ শক্তিটার নাম "ইসলাম"।

আমি ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরাণ ও হাদীস বারবার পড়েছি, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছি, দেড় হাজার বছর ধরে এই মতবাদ মানুষ কি করে গ্রহণ করে চলেছে ভেবে পাই না। ভেবে পাই না কি করে মানুষ ইসলামকে সনাতন বৈদিক ধর্মের সমার্থক বলে। বিদগ্ধ ব্যক্তিদের "সব ধর্মইতো সমান" এমন নির্বোধ উন্মাদসুলভ বক্তব্য শুনে বিস্ময় প্রকাশ করি। হয়তো অনেকে প্রশ্ন করবেন, তবে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কেন ? বিতর্কে যেতে চাই না। শুধু একবার ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেখানে মনুষ্যত্ব, গণতন্ত্র , নারীর স্বাধীনতা, মানুষের মৌলিক অধিকার কি খুঁজে পাই? কোরাণ পড়ে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে মানুষ ও মুসলমান দুটি ভিন্ন শব্দ। যে কোরাণসম্মত মুসলমান সে মনুষ্যত্ববর্জিত, পরধর্মবিদ্বেষী, পরমত অসহিষ্ণু হবেই। আজ মানুষ যখন মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে, বিস্মিত হই কেন এখনও ধর্মের নামে একশ্রেনী অন্যশ্রেনীর মানুষের প্রতি এত ঘৃণা এত বিদ্বেষ সঞ্চার করতে পারে! আসলে গোটা মুসলমান সমাজ আজ মোল্লা-মৌলভী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই শিক্ষিত পন্ডিত মুসলমানেরা অন্যায় জেনেও ইসলামের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে না। ইসলাম এমনই এক স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী অশুভ শক্তি যার জন্য মুসলমান সমাজে একটাও রামমোহন ও বিদ্যাসাগর জন্মাতে পারে না।

হিন্দু সমাজের ধর্ম নিরপেক্ষ, উদার, মানবতাবাদী, সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাও ইসলামী তত্ত্ব পড়েন না এবং ইসলামের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত হিম্মতও তাঁদের নেই। যাঁরা ধর্মকে অফিঙ বলে, হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করে তৃপ্তিবোধ করেন তাঁদের মধ্যে একটাও পিতার পুত্র নেই যিনি পরধর্ম বিদ্বেষী ইসলামের নিন্দা করেন, প্রতিবাদ করেন। কোন লেখক বা কোন সাংবাদিক এ বিষয়ে কলম ধরতে সাহস করেন না। ইসলামী তত্ত্ব পাঠ করার পর মনে করি যে ইসলামের নামে সর্বনাশা আগ্রাসন থেকে মনুষ্যজাতিকে যদি সচেতন করা না যায়, পৃথিবীকে যদি ইসলামের বর্বরতা, উন্মত্ততা থেকে উদ্ধার করা না যায় তবে মানুষকে আবার কষ্ট করে সভ্য হতে হবে। আদিম অসভ্য

যুগে ডুবে যাবে আবার মানুষ। এত জ্ঞান-বিজ্ঞান, এত সাধনা আমাদের অসাবধনতা, আমাদের প্রতিকার প্রবণতার অভাবে দুনিয়া থেকে হারিয়ে যাবে।

অমানবিক-পরধর্ম বিদ্বেষী

কোরাণের বহু জায়গায় অমানবিক ও পরধর্মবিদ্বেষী আয়াত ছড়িয়ে আছে। আমি সেখান থেকে কিছু আয়াত নিয়ে তার যথার্থ ব্যাখ্যা পাঠকবর্গের কাছে তুলে ধরছি। সাবধানী বিচক্ষন পাঠক আয়াতগুলি পড়ে সিদ্ধান্ত নেবেন যে ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি ইসলাম তার অন্তর্ভুক্ত হয় কি না। সংস্কারমুক্ত প্রকৃত মানবিক মুল্যবোধে উদ্দীপ্ত মুসলমান বন্ধুর কাছেও একই আহ্বান জানাচ্ছি।

¤ "হে বিশ্বাসীগণ নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (বিনিময়ের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।" • সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ১৭৮

বোঝা যাচ্ছে আল্লা তাঁর অনুগামীদের নরহত্যার ব্যাপারে অনুমতি দিচ্ছেন। বিনিময়টা যেভাবেই হোক না কেন যে শাস্ত্র যে দর্শন মানুষকে হিংসা শেখায়, নরহত্যায় উৎসাহিত করে তা কি করে সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়? তার ফলে মনুষ্যত্ব পশুত্বে নেমে যেতে বাধ্য নয় কি?

¤ "আর যেখানে পাও, তাদের হত্যা কর।" •সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ১৯১

যারা অমুসলমান তাদের হত্যা করতে বলা হয়েছে। 'কোরাণ' মহান আল্লার বাণী। আল্লা যদি ভগবান হন তবে তিনি কি করে অমুসলমানদের হত্যা করার নির্দেশ দিতে পারেন? যে গ্রন্থ অপর ধর্মাবলম্বীদের হত্যা করতে নির্দেশ দেয় তা কি কখনো সুস্থ মনুষ্য সমাজে আদৃত হওয়া উচিত না কি ঐ ধর্মকে মানুষের ধর্ম বলা যেতে পারে? অথবা মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলমানদের একত্রে বাস করা সম্ভব? সেকুলার বন্ধুরাই উত্তর দিতে পারেন।

¤ "আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না তাদের ধর্মদ্রোহীতা দূর হয় এবং আল্লার দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত না হয়।" • সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ১৯৩

আল্লার রসুল জানতেন যে তাঁর এই অমানবিক, আধ্যাত্মহীন, মনুষ্যবর্জিত ধর্ম মানুষ স্বাভাবিক ভাবে মানুষ গ্রহণ করবে না, তাই যুদ্ধ করার ফতেয়া জারী করে জোরপূর্বক আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করব। ইতিহাস এই আয়াতটির সার্থকতা প্রমান করেছে। ইসলাম যেখানেই গেছে তরোয়াল চালিয়ে সেখানকার ধর্ম-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছে। এবং ভালবাসা দিয়ে নয়, মহত্ত্ব দিয়ে নয়, ভয় দেখিয়ে তরবারি দেখিয়ে আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছে। এইরকম পরমত অসহিষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী অশুভ শক্তিকে ধর্ম বলা যাবে?

¤ "এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোক ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।" • সূরা আল-ই ইমরাণ / আয়াত ৮৫

আল্লা যদি পরম সত্য ও সর্বস্রষ্টা হন তবে পরধর্মের প্রতি তাঁর ঈর্ষা কেন? ইসলাম তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই মনোনীত ধর্ম, তবে মানুষ অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে কেন? তবে কি আল্লা জানেন তাঁর মনোনীত ধর্মে অপূর্ণতা আছে তাই ইসলাম ছেড়ে যাতে মানুষ

অন্য ধর্ম গ্রহণ না করে তার জন্য তাদের পরলোকের ভয় দেখানো হয়েছে। এরকম অনুদার আত্মকেন্দ্রিক অগণতান্ত্রিক ধর্ম মনুষ্য সমাজের মুক্তির পথ কি করে দেখাতে পারে?

◘ "আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে যাকে তোমার ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার।"

• সূরা নিসা / আয়াত ৩

এই আয়াতে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিষয়টি পিতৃহীনাদের প্রতি অবিচার করা। দ্বিতীয় বিষয়টি যাকে ইচ্ছা বিবাহ করা এবং তৃতীয় বিষয়টি বিবাহের সংখ্যা এক গণ্ডায় পৌছানো।

পিতৃহীনা অর্থাৎ রমণীর প্রতি অবিচার অর্থে তার প্রতি অত্যাচারও করা যেতে পারে এ আল্লা খুবই নিশ্চিত যে তাঁর বান্দারা অনাথ রমণীদের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করবে। হে আল্লা, আপনার ধর্মাবলম্বী বিশ্বাসীরা এমন অমানুষ হবে?

যাকে ইচ্ছা বিয়ে করা যেতে পারে এ আল্লার ফতোয়া। এ কেমন সামাজিক কথা? বিয়ের সময় বয়স পরিচয়ের প্রয়োজন নেই নাকি স্বয়ং হজরত পনের বছরের জ্যেষ্ঠ খাদিজাকে বিয়ে করে আইনটা পাশ করে দিয়েছেন। যাকে ভাল লাগে তাকেই যদি বিয়ে করার অনুমতি থাকে তবে সামাজিক প্রথা মনুষ্যচিত কর্ম বলে কি কিছু থাকবে? সমাজ তখন ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। তাই যে ধর্ম সমাজকে এ ধরণের সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয় তাকে কি গ্রহণ করা কর্তব্য ?

তৃতীয় বিষয়টি অতি সাঙ্ঘাতিক এবং অতি অমানবিক। আজকের দিনে যেখানে জনসংখ্যা সঙ্কোচনের কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হয় তখন চারটে বিয়ে করার মতো প্রথা শুধু অবাস্তব নয়, ধিক্কারযোগ্যও বটে। এখানে নারী স্বাধীনতাকেও খর্ব করা হয়েছে। আল্লার এই বাণী মানুষকে আরও ভোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নারীর কামনার জালে বন্দী করে পুরুষকে কামনার পশু করে তোলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এ ধর্ম কখনোই মানুষকে আধ্যাত্মিক চিন্তা, ত্যাগব্রতী মানসিকতায় গড়ে তুলতে পারে না?

◘ "অবিশ্বাসীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" • সূরা নিসা / আয়াত ১০১

কোরাণের ভাষায় যারা ইসলামের অনুগত নয় অর্থাৎ যারা মুসলমান নয় তারা অবিশ্বাসী। অন্য নামে কাফের, মুশরিক ইত্যাদি। বর্তমান আয়াতে দীন দুনিয়ার মালিক ঘোষণা করে দিলেন যে অবিশ্বাসীগণ অর্থাৎ অমুসলমানগণ মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু। একটা মুসলমান ছোট থেকে এই মানসিকতায় গড়ে উঠেছে। সর্বধর্ম সমন্বয়কারীরা সাবধান। 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই' কথাটা যে কত ভ্রান্ত আশা করি বুঝতে পারছেন। শত্রুর সঙ্গে কখনোই তারা মিত্রতা স্থাপন করতে পারে না। যদি কখনও করে জানতে হবে উদ্দেশ্য মোটেই সাধু নয়।

◘ "হে বিশ্বাসীগণ, বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না।"

• সূরা নিসা / আয়াত ১৪৪

আয়াতটি পরিষ্কার বলে দেয় যে অবিশ্বাসী অর্থাৎ অমুসলমানেরা কখনও মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস আয়াতটির সার্থকতা প্রমান করে তবু কিছু কান্ডজ্ঞানহীন নির্বোধ ব্যক্তি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিষ্ফল বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে।

ফলস্বরূপ মুসলমান তার সুবিধা মতো গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়ে। একইভাবে রাষ্ট্রনেতাদের কাঁচকলা দেখিয়ে পাকিস্থান কায়েম করেছে। যে সমাজ অন্য সমাজকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না, কেমন করে একটা গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তারা মানিয়ে নিতে পারে? প্রগতিশীল যুগে মনুষ্য সমাজে এই ধরণের মানসিকতা কেমন করে সমর্থনযোগ্য হয়?

◘ "অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।"

●সূরা নিসা / আয়াত ১৫১

কোরাণে মাঝে মাঝে আল্লার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে আল্লা পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল। তবে তাঁর দয়া কি শুধু মুসলমানদের জন্য? আল্লা যদি সকল মনুষ্যগোষ্ঠী, পৃথিবীর সবকিছুই স্রষ্টা হয়ে থাকেন তবে তাঁর এ পক্ষপাতিত্ব কেন? অমুসলমানদের প্রতি কেন এতো ঘৃণা? এইরকম বিভেদ সৃষ্টিকারী ধর্ম কি কখনও মানুষের ধর্ম হতে পারে অথবা মানুষের নৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে?

◘ "অবশ্য যে কেউ আল্লার অংশী করবে নিশ্চয়ই আল্লা তার জন্য স্বর্গ নিষিদ্ধ করবেন ও আগুন তার বাসস্থান এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

● সূরা মায়েদাহ্ / আয়াত ৭২

কোরাণে মুর্তিপূজককেই অংশীবাদী বলা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে মুর্তিপূজকেরা আল্লার চক্ষুশূল। ভয় দেখিয়ে যখন দলে টানা গেল না তখন স্বর্গ নিষিদ্ধ করলেন। প্রশ্ন জাগে, হাজার হাজার বছর ধরে মুর্তিপূজায় বিশ্বাসী হয়ে যারা ধর্মাচরণ করে আসছে তাদের কি কেউই স্বর্গলাভ করেনি? কিন্তু ইতিহাস হিন্দু সমাজের মধ্যে এমন অনেক মুর্তিপূজক মহাপুরুষ পাই যাঁদের সঙ্গসুখই স্বর্গসুখের সমান যদিও সে স্বর্গ আল্লা বর্ণিত হুরীখানা নয়।

◘ "তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং অংশীবাদীদের হতে দূরে থাক।"

● সূরা আন্‌আম / আয়াত ১০৬

এই আয়াতটি কোরাণের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ আছে। মুসলমান যাতে আল্লার দল ছেড়ে চলে না যায় তাই বারবার তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এখানে আল্লার স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ পায়। অংশীবাদীদের থেকে দূরে থাকার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ আল্লা নির্দেশিত ইসলামে ধর্মের ব্যাপার বলে তো কিছুই নেই। শুধু ভয় আর হুরীর লোভ দেখিয়ে দল পাকাবার কথাবার্তা, যদি এখন মুসলমান অংশীবাদী হিন্দুদের সান্নিধ্যে যায় তবে আসল নকল চিনে ফেলবে। মুসলমান হয়ে যাবে মানুষ তাই তাদের পৃথক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হোল। শুধু তাই নয় এই মানসিকতায় তৈরী হলে স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য থাকবে না বরং বিচ্ছিন্নতার প্রতি তার ঝোঁক হবেই।

◘ "নিশ্চয় যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আসবে আর এভাবে আমি অপবাদ রচনাকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।"

● সূরা আরাফ / আয়াত ১৫২

হিন্দুরা গরুকে গো-মাতা জ্ঞানে পূজা করে তবে তাদের বিরুদ্ধাচারণ করে এ ধরণের আয়াত কেন? আল্লা এত পরাশ্রীকাতর কেন যার জন্য তিনি গো-পূজকদের সহ্য

করতে পারছেন না। ভারতের জাতীয় জীবনে গরু একটি শ্রদ্ধার স্থান পেয়ে আসছে সেখানে আল্লার ক্রোধ ও লাঞ্ছনার ভয় দেখিয়ে কোন মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অগণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতারও পরিপন্থী। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করে কারা কোরাণের এই সকল পরধর্ম বিদ্বেষী আয়াতগুলি থেকেই তার নিদর্শন পাওয়া যাবে।

¤ "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে, তাদের অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে।" ● সূরা তওবা / আয়াত ৫

এই আয়াতটি প্রত্যেকটি অমুসলমানের মনে রাখা উচিত। তবে মুসলমান সমাজের বর্বরতা স্মরণে থাকবে। বিশেষ করে নির্বোধ সর্বধর্ম সমন্বয়বাদীদের আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিষিদ্ধ মাস বলতে মহরম বা রমজান মাস বোঝায় আর অংশীবাদী অর্থে মূর্ত্তিপূজক। অর্থাৎ আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় যে রমজান বা মহরম মাস অতিক্রান্ত হলে মূর্ত্তিপূজকদের অর্থাৎ হিন্দুদের হত্যা কর। বিস্মিত হই, আল্লা যদি প্রকৃতই ঈশ্বর হবেন তবে কি করে এটা তার বাণী হয়। এরকম পরধর্ম বিদ্বেষী অমানবিক জহ্লাদস্বরূপ বাক্যটি যে গ্রন্থে স্থান পায় তাকে কি 'ধর্মগ্রন্থ' বলা যায়, নাকি এই গ্রন্থের অনুগামীরা 'মানুষ' নামের অধিকারী হতে পারে? ধর্মের নামে এই যে বর্বরতা, মানুষের প্রতি চরম ঘৃণা যারা ছড়িয়ে বেড়ায় তারা সভ্য সমাজে ধিক্কারযোগ্য এবং এই বর্বরতার প্রতিবাদ করতেও যারা ভয়ে সঙ্কুচিত হয় মনুষ্য পদবাচ্যের অধিকারী তারাও হতে পারে না।

¤ "যারা সত্যধর্ম (ইসলাম) অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্য্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিজিয়া দেয়।"

● সূরা তওবা / আয়াত ২৯

ইসলাম সৃষ্টির পর থেকে মানুষকে জোর করে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছে এই আয়াতটিই সে কথার প্রমান রাখে। তাই ইসলামের মতো সাম্রাজ্যবাদী আর কে হতে পারে? যুদ্ধে যুদ্ধে রক্তের বন্যা বইয়ে সুস্থ সমাজে অশান্তি ও দানবতা সৃষ্টিরই অপর নাম ইসলাম। ইসলাম যেখানে ক্ষমতাশালী সেখানে অন্য ধর্ম-সংস্কৃতি বলে কিছু থকে না। অবিশ্বাসী বা কাফেরদের উপর জিজিয়া কর চাপানো হয়। এটা আরব মনুষ্যজাতির মুক্তির পথের দিশারী শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ধর্ম। এইরকম শান্তিধ্বংসকারী মানবতার বিভীষিকা ইসলাম কৃপাণ দেখিয়ে মুসলমান তৈরী করতে পারে, কিন্তু একটাও মানুষ তৈরী করতে পারে না। তাই সকলের চিন্তা করা উচিত যে পবিত্র মানব সভ্যতার ধ্বংসকারী এই ইসলাম বিশ্বশান্তির যুগে অগ্রণী সমাজে কতটা গ্রহণযোগ্য?

¤ "হে বিশ্বাসীগণ অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জেনে রেখো যে আল্লা সাবধানীদের সাথে আছেন।" ● সূরা তওবা / আয়াত ১২৩

স্বয়ং আল্লা মুসলমানদের নিকটবর্তী অমুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এই দস্যুবৃত্তি করতে যে শিক্ষা দেয় সে জগৎপিতা হয় কি করে? শুধু তাই নয় আল্লা মুসলমানদের এই বর্বর কাজে সাহায্য করবেন। তবে কি কোরাণের বর্ণনায় আল্লা

নিশ্চয়ই মনুষ্য সমাজ ধ্বংসকারী কোন দানব এবং মহম্মদ তার একজন এজেন্ট মাত্র। আয়াতটি থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে মুসলমান মনুষ্যগুণচ্যুত একটি বর্বর জাতি এবং তাদের সঙ্গে অমুসলমানদের সহাবস্থান কখনই সম্ভব নয়।

◘ "যাতে তোমরা আল্লা ব্যতীত অপর কিছুর উপাসনা না কর আমি তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিনের আশঙ্কা করি।" ● সূরা হূদ / আয়াত ২৬

এখানে আল্লা ভয়ঙ্কর শাস্তির ভয় দেখিয়ে জোর করে মানুষের আনুগত্য চান। ইসলামের মতে আল্লা ব্যতীত অন্য কোন উপাসনা করা পাপ। তবে ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মের মিলন হয় কি করে? আর যাদের আল্লা এমন স্বৈরতান্ত্রিক নিষ্ঠুর পরধর্ম বিদ্বেষী হয়, তার সঙ্গে পবিত্র করুণাময় পরমসহিষ্ণু ভগবানের কি করে সাদৃশ্য রচনা করা যায়? সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী বাতুল ব্যক্তিগণ এর উত্তর দেবেন কি ?

◘ "তুমি আল্লার সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লার সত্ত্বা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল।" ● সূরা ক্বাসাস / আয়াত ৮৮

আল্লা কিছুতেই অন্য উপাস্যকে সহ্য করতে পারেন না। তাই ঘোষণা করলেন, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। যদি আল্লার সত্ত্বা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে তো পৃথিবীতে অন্য উপাসকেরা অর্থাৎ অমুসলমানরা থাকত না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে আল্লার বান্দারাই নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও ঘৃণার বহ্নি ছুটিয়ে কি কখনও আধ্যাত্মিকমার্গে পৌছানো যায়?

◘ "যেদিন তোমাদের (অবিশ্বাসীদের) প্রবলভাবে আক্রমণ করব সেদিন আমি তোমাদের শাস্তি দেবই।" ● সূরা দোখান / আয়াত ১৬

এ এক ভয়ঙ্কর আয়াত। কোন ধর্ম পুস্তকে স্থান পেতে পারে না। আল্লা কি দস্যু? তাই যারা ইসলামে বিশ্বাসী হবে না, তিনি তাদের রাগে, দুঃখে যেহেতু তারা ইসলাম কবুল করেনি আক্রমণ করবেন। এমন মানব বিদ্বেষী কি ঈশ্বরের রূপ হতে পারে? ইসলামের ঈশ্বর স্বয়ং যখন অ-ইসলামীদের প্রতি এত ক্রুদ্ধ হিংস্র তাহলে মুসলমানরা যে অমুসলমানদের প্রতি কেমন মানসিকতা নিয়ে চলবে তা সহজেই অনুমেয়।

◘ "অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা ওদের সম্পুর্নভাবে পরাভূত করবে তখন ওদের মজবুত করে বাঁধবে।" ● সূরা মোহাম্মদ / আয়াত ৪

এক জঘণ্য পরধর্ম বিদ্বেষ ভরা এই আয়াতখানি। আল্লা মহান প্রতিপালক হয়ে পরমেশ্বর হয়ে কি করে তাঁরই সৃষ্ট সন্তানকে অবিশ্বাসীদের গর্দানে আঘাত করার নির্দেশ দেন? এ ধরণের আয়াত পাঠ করলে মুসলমানদের মনুষ্য মনোবৃত্তি কলুষিত হয়ে যাবে এবং সে হয়ে উঠবে একজন হিংস্র খুনী। তাই যে ধর্ম, যে গ্রন্থ এই ধরণের আয়াতকে স্থান দেয় তা কখনই মনুষ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শুধু অমুসলমানই নয় মুসলমানদেরও আজ ভাবতে হবে যে ধর্মের নামে প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে যা পালন করে আসছে সেটা প্রকৃত কি? প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জানা উচিত যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ওপর ভিত্তি করে কখনই মানুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না, আত্মার মুক্তি আসে না।

◘ "যারা আল্লাকে ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না আমি সে সব অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।" **• সূরা ফাতাহ্ / আয়াত ১৩**

যারা আল্লা রসুলের প্রতি অনুগত নয় তারা কাফের, হিন্দু দর্শনের মতো ইসলাম সমস্ত মানবজাতিকে 'অমৃতের পুত্র' বলে সম্বোধন করে না। আল্লার অনুগামী যারা নয় তাদের জন্য যখন আল্লা অগ্নি (এ ছাড়া তাঁর কিছু নেই!) প্রস্তুতই রেখেছেন তবে তারা পুড়ে মরছে না কেন? আসলে আল্লা হিসাবে ভুল করেছেন, মিথ্যা আয়াত প্রণয়ন করে মানুষকে বোকা বানিয়ে আর ভয় দেখিয়ে দলভারী করা যায় না। অবিশ্বাসীদের মনে যদি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সাধু প্রচেষ্টা থাকত তবে আল্লা ও রসুলকে ধন্যবাদ দিতাম। আসলে যেখানে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি থাকে না সেখানে দল তৈরী করতে হলে ভয় দেখিয়ে জোর করে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া গতি নেই।

◘ "হে বিশ্বাসীগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কোর না।"

• সূরা মুমতাহ্বানা / আয়াত ১

'পরধর্ম বিদ্বেষ বিষয়ক' আলোচনার শেষ আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা মুসলমান নয় তারা আল্লা ও মুসলমানদের শত্রু। বিস্মিত হই মহান প্রতিপালক আল্লারও শত্রু আছে। মানুষের শত্রু থাকতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের শত্রু কি করে হয়! তবে কোরাণে বর্ণিত আল্লা কে? সবচেয়ে বড় কথা, কোরাণের নির্দেশ আমুসলমান কখনই মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। এ কথার সার্থক প্রমান বিশ্ব ইতিহাসে ছড়ানো আছে।

◘ "যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লা সর্বশক্তিমান।" **• সূরা তওবা / আয়াত ৩৯**

◘ "বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং (আর) যারা আল্লার পথে স্বীয় ধনপ্রাণ দ্বারা জেহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধনপ্রাণ দ্বারা জেহাদ করে আল্লা তাদের যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; ... তাদের আল্লা মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" **• সূরা নিসা / আয়াত ৯৫**

জেহাদকে সঠিক বোঝার জন্য আয়াতদুটির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে দেশে অমুসলমানদের উপর মুসলমানদের আক্রমণের অন্যতম উৎস এই আয়াতদুটি। কোন মুসলমান সৎভাবে জীবনযাপন করলে স্বর্গ পাবে; কিন্তু অবিশ্বাসী বা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমান আল্লার কাছে শ্রেষ্ঠ। আল্লা তার জন্য রেখেছেন মহাপুরস্কার; অর্থাৎ উন্নত স্বর্গ যেখানে সত্তরেরও বেশী কুমারী মেয়ে (হুরী) এবং আরও অনেক লোভনীয় জিনিস পাওয়া যাবে (হাদীস / স্বর্গের নারীরা, জামে তিরমিজি)। কাফেরদের বিরুদ্ধে আক্রমণের একমাত্র কারণ তারা আল্লায় বিশ্বাস করে না।

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলি থেকে আশাকরি পাঠক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন যে মানুষ ও মুসলমান দুটি ভিন্ন শ্রেনী। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে একশ্রেণীর নির্বোধ মানুষ হিন্দু মুসলমানের মিলন, সর্বধর্ম সমন্বয়ের মত অবাস্তব, অসাধ্য বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করে আসছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করি এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হন। ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান (কোরাণসম্মত)

অমুসলমানদের বন্ধু হতে পারেনি। আমরা চিরকালই (ইসলামের জন্ম থেকে) তাদের শত্রু। তাই শত্রুর সঙ্গে জোর করে মিত্রতা স্থাপন ক্লীবতা, ভন্ডামী ও আত্মহননের নামান্তর।

আল্লার স্বরূপ

বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যদি ঈশ্বরের রূপকে বিচার করি তবে বলব সত্য, সুন্দর ও সর্বজীবের মঙ্গলময় কর্তাই শ্রীভগবান। প্রত্যেক মানুষের প্রতি, প্রতিটি শ্রেনীর উপরে রয়েছে তাঁর করুণা ও আশীর্বাদ। ভগবানকে যারা ভালবাসে না, যারা বিশ্বাস করে না ভগবান তাদেরও ভালবাসেন। তাঁর কাছে মানুষের কোন বিভেদ নেই। ভগবৎ সাধনার ফলে প্রতিটি মানুষই মুক্তির অধিকারী হতে পারে। কোরাণে আল্লাকেই ঈশ্বর বলা হচ্ছে। বহুদিন থেকেই বহু মানুষ বলে আসছেন ভগবান আল্লা একই কথা। যাত্রাপালার মীরাবাঈকে দিয়ে বলানো হল ভগবান ও আল্লার কোন তফাৎ নেই। অনেক সাধু পণ্ডিত বিদ্বান ব্যক্তিও এই একই মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু এই অন্তঃসারশুন্য চিরন্তন মিথ্যে কথাটা এই সকল বিজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞতাকেই প্রকাশ করে। ভগবানের সংজ্ঞা আমরা যেভাবে নির্ণয় করে থাকি তা কিন্তু আল্লার ক্ষেত্রে কখনই খাটে না। ভগবানের স্বরূপ কোরাণে বর্ণিত আল্লার স্বরূপ এক নয়। গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী করুণাময় হিসাবে যেখানে ভাগবানকে জানি, আল্লার পরিচয় সেখানে অগণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী, সঙ্কীর্ণ চিন্তাসম্পন্ন দলনেতা। এটা আমার কল্পকথা নয়। বর্তমান আলোচনায় কোরাণ থেকেই উদ্ধৃত আয়াতের সাহায্যে আমার বক্তব্যকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি । আরও একটা প্রশ্ন, আল্লাকে নিরাকার বলা হয় এবং তাঁকে অংশী করা বা তাঁর আকার নির্ণয় করা পাপ একথা ইসলাম বলে। কিন্তু আল্লারও আকার আছে কিছু আয়াতেই তার প্রমান মিলবে। আল্লার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হবার পর আশা করি পাঠকবর্গের বিভ্রান্তি কেটে যাবে এবং অজ্ঞের মতো আর ভগবান ও আল্লায় মিশিয়ে ফেলবেন না। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে মানুষ জন্মসূত্রেই মুসলমান হয় না। একজন মুসলমান লেখকের রচনাতেই পড়েছি যে 'কলমা' পড়ার পর মানুষ মুসলমান হয়। তাহলে 'মানুষ' ও 'মুসলমান' শব্দ দুটোর পৃথক অস্তিত্বকে আমরা স্বীকার করতে পারি। একই কারণে বলা যায় ভগবান ও আল্লা পৃথক শব্দ, কখনই একে অন্যের পরিপূরক নয়। এখানে শুধু কোরাণের ও হাদীসের বক্তব্য উল্লেখ করে আল্লার প্রকৃত স্বরূপকে তুলে ধরা হয়েছে এবং 'ভগবান ও আল্লা এক' এই চিরন্তন মিথ্যে শ্লোকের উপর তীব্র সত্যের কশাঘাত করা হয়েছে।

▫ **"আল্লা যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে শেষ বিচারের দিন আল্লা তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না।"** **• সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ১৭৪**

এখানে আল্লা বলছেন যে কিয়ামতের দিন তিনি অবিশ্বাসীদের সঙ্গে কথা বলবেন না। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের সঙ্গেই একমাত্র কথা বলবেন। কথা বলার জন্য মুখের দরকার। তবে নিশ্চই আল্লার মুখ আছে এবং সেটি একটি দেহের সঙ্গে যুক্ত। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে আল্লার দৈহিক আকৃতি আছে। তবে তাঁকে নিরাকার বলা হয় কেন এবং পৌত্তলিকদের প্রতিই বা কেন এতো ঘৃণা?

◘ "তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজকে সযত্নে রক্ষা করবে এবং আল্লার সম্মুখে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।"

● সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ২৩৮

আয়াতটির শেষাংশটুকু আলোচ্য। আল্লা তো নিরাকার। পৃথিবীময় তাঁর ব্যাপ্তি, তবে তাঁর সম্মুখে কি করে নামাজকারীর দাঁড়ান সম্ভব? এটা একমাত্র কোন আকৃতির সম্মুখেই হতে পারে। কারও সামনে দাঁড়াতে গেলে অবশ্যই তাঁর আকার থাকবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আল্লার নিশ্চয় কোন আকৃতি আছে। এবং কোরাণে আল্লা নামাজকারীকে তাঁর সেই আকৃতির সম্মুখে দাড়াঁতেই নির্দেশ দিয়েছেন। তবে আল্লাকে কেবলমাত্র নিরাকার বলার অর্থ কি?

◘ "আল্লা যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দলের দ্বারা দলন না করতেন তবে নিশ্চয়ই পৃথিবী কলুষিত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লা বিশ্বজগতের প্রতি মঙ্গলময়।"

● সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ২৫১

আলোচ্য অংশটুকু আয়াতটির শেষাংশ। আল্লার স্বরূপকে অনেক বিচিত্ররূপে দেখানো হয়েছে। প্রথমেই দেখি তিনি মানবজাতির একজনকে অন্যজনের দ্বারা দমন করেছেন। অতএব তিনি এক খল চরিত্রের ব্যক্তিত্ব। জগতের প্রতিপালক হয়েও তিনি মানবজাতির মধ্যে মিলন ঘটাননি। অতএব নিশ্চয় তিনি প্রতিপালক নন। একজন বিভেদকামী ঐক্যের পরিপন্থী। আবার বলা হয়েছে একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করলে জগত কলুষিত হোত। এটা বড়ই হাস্যকর ও আশ্চর্যজনক কথা। মানবজাতির মধ্যে হিংসা, মারামারি প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবী পবিত্র হয়? তবে আল্লার কাছে পবিত্রতা ও শান্তির সংজ্ঞা কি? ইসলামে ও ঐশ্লামিক রাষ্ট্রে যে ধরণের পবিত্রতা ও শান্তির সন্ধান পাই সেটাই কি আল্লা বর্ণিত অ-কলুষতা? আরও মজার কথা, ধ্বংসকারী, বিভেদকামী আল্লাকেই বিশ্বজগতের মঙ্গলময় বলা হয়েছে। এর থেকে আমরা সহজেই আল্লার রূপকে খুঁজে পাচ্ছি।

◘ "... আল্লা বলবেন ... আর আমরা তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করব।"

● সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ২৫৯

আয়াতটি অনেক বড়। আলোচ্য বাক্যটাকেই শুধু তুলে ধরা হয়েছে। জনৈক ব্যক্তিকে করব থেকে পুনরুত্থিত করে আল্লা তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। এখানে তিনটি প্রশ্ন দেখা যায়। প্রথমটি হোল কিয়ামত বা শেষ বিচারের দিনই তো সকলের একসাথে পুনরুত্থান হবে, তবে এ ব্যতিক্রম হল কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ব্যক্তিটির সাথে আল্লার কথোপকথন তাঁর আকার স্বীকৃতি দেয় না কি? সবথেকে উল্লেখযোগ্য তৃতীয় প্রশ্নটি, বাক্যটিতে আল্লা "আমরা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই আমরা কে? 'আল্লা' তো একজনকেই জানতাম, তবে আমরা আসে কেন? তবে কি আল্লা বিশ্ব পরিচালক কমিটির চেয়ারম্যান; "একমেবাদ্বিতীয়ম্" আল্লার সপক্ষে বলা যায়।

◘ "এবং যে কেউ আল্লা, তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লার দল বিজয়ী হবে।" **● সূরা মায়েদাহ্ / আয়াত ৫৬**

আল্লার এই বাণীটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হচ্ছে আল্লারও বর্তমান পলিটিক্যাল পার্টির মতো কোন দল আছে যার কাজ দল পাকানো। যিনি জগতের প্রতিপালক, এ

জগতের সবকিছুই তো তাঁর, তবে তাঁর পৃথক দল কেন? তবে কি আল্লা জগৎস্রষ্টা বা জগৎ প্রতিপালক নন? তবে নিশ্চয় বলব যে আল্লা ও ভগবান সমার্থক নয়। আল্লা মুসলমানদের ত্রাতা আর ভগবান সর্বমানবের, সর্বজীবের, সকলের।

■ **"আল্লা অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"**

● সূরা মায়েদাহ্ / আয়াত ৬৭

যিনি পিতা তাঁর কাছে সব সন্তানই সমান। তিনি কি অবাধ্য সন্তানকে পরিত্যাগ করেন, না কি সদুপদেশ দিয়ে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন? তবে আল্লা কি ধরণের জগৎ প্রতিপালক? কেন তাঁর পক্ষপাতিত্ব? কেন অমুসলমানদের প্রতি তাঁর এত ঘৃণা, বিদ্বেষ? তবে আমরা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আল্লাই ভগবান নন। এই আয়াত থেকে আরও একটা প্রশ্ন জাগে, আল্লা যখন অমুসলমানদের সৎপথে পরিচালিত করেন না, তবে তারা কি দীর্ঘদিন ধরে অসৎ পথেই পরিচালিত হচ্ছে? হিন্দু সমাজের মধ্যে আমরা বহু সৎ মনীষীর পরিচয় পাই যাঁরা ছিলেন সত্যের পূজারী। তবে আল্লার কথামতো অমুসলমানেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না কেন?

■ **"বল তোমাদের ঊর্দ্ধদেশ অথবা তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে, তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করতে তিনিই সক্ষম।"** **● সূরা আন আম / আয়াত ৬৫**

এখানে আল্লাকে বিভেদকামী ও হিংসা, অশান্তি সৃষ্টিকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। অপরাধীকে, অধার্মিক নিশ্চয় কর্মফল ভোগ করতে হবে, কিন্তু এইভাবে মানবজাতির মধ্যে হিংসা ও হানাহানি সৃষ্টি করে মানুষকে অধর্মের পথে, বিশ্বশান্তিকে এক অনিশ্চিত অশান্তির কোলে ঠেলে দিতে ঈশ্বর পারেন কি? একপক্ষকে অপরপক্ষের দিকে লেলিয়ে দিয়ে ধবংসের আস্বাদ উপভোগ করে একমাত্র শয়তান। ভগবানের রূপ জানি শান্ত, সুন্দর, পবিত্র। শয়তানের মানসিকতা কি করে সেখানে ঠাঁই পেতে পারে? এরপরেও কি ভগবান আর আল্লাতে কোন তফাৎ নেই, বলতে পারি?

■ **"এবং কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি। আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল।"**

● সূরা আরাফ/ আয়াত ৪

আয়াতটির প্রথম বাক্যটি কোরাণের বহু জায়গায় আছে। মঙ্গলময় আল্লার একি রূপ? দেখা যাচ্ছে ধ্বংস করতে আল্লা খুব পারদর্শী। শুধু তাই নয়। মানুষ যখন দুপুরে অথবা রাত্রে বিশ্রাম করছিল তখনই অসহায় নিরস্ত্র মানুষগুলোর ওপর শুরু হোত তাঁর আক্রমণ। তবে আল্লা কি দস্যু তস্কর? স্বয়ং আল্লা ধ্বংসকারী বলেই তাঁর বান্দারাও যে দেশে গেছে সেখানে নিরীহ মানুষগুলোর ওপর কৃপাণ চালিয়েছে এবং আল্লার অনুকরণেই সেখানকার সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে। ইতিহাসে তার স্বপক্ষে বহু নিদর্শনই পাই, তাই আল্লাকে ভগবানের আসনে বসানোর মতো নির্বুদ্ধিতা আর কিছু হতে পারে না।

■ **"বল 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ' আল্লা এবং রসুলের, সুতরাং আল্লাকে ভয় কর।"**

● সূরা আনফাল/ আয়াত ১

'আনফাল' শব্দের অর্থ অমুসলমানদের মুসলমান কর্তৃক লুট করা ধনসম্পদ, যা যুদ্ধের আগে বা পরে হস্তগত হয় কোরাণের মতো ধর্মগ্রন্থে 'আনফালে'র মতো সুরাও স্থান পায়। বর্তমান আয়াতে আল্লাকে স্বৈরাচারী ডাকাত সর্দার এবং মহম্মদকে তাঁর সহকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। আল্লার চেলারা যুদ্ধ করে অর্থাৎ ডাকাতি করে যা লুট করে আনবে সেগুলো 'আল্লা' নামক সর্দারকে দিয়ে দিতে হবে এবং সর্দার তখন প্রসন্ন হয়ে সহকারী মহম্মদকে কিছু ভাগ দেবে। লুটের মাল গ্রহণ করা যে অন্যায়, ইসলাম পূর্ববর্তী আরবদের এই শুভ মানসিকতাকে ধ্বংস করল এই আয়াত। তাই শেষে বলা হলো আল্লাকে ভয় কর, যাতে আল্লার এই স্বৈরাচারী মনোভাবের কেউ যেন প্রতিবাদ করার সাহস না পায় কারণ আল্লাতো জনপদ ধ্বংস করে রেকর্ড করেছেন তাই তাঁকে সমীহ যে করবে না সে ধ্বংস হবে। অর্থাৎ আল্লার চেলারা তাঁকে অবশ্যই কোতল করবে তাহলে কোরাণে বর্ণিত আল্লাকে তস্কর বা লুটেরা ছাড়া আর কি বলা যায়।

◘ "যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব সুতরাং তাদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর।" **● সূরা আনফাল/ আয়াত ১২**

অবিশ্বাসী অর্থাৎ অমুসলমানদের প্রতি আল্লার কি প্রচন্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ। আল্লা তাঁর বান্দাদের হিংসার পথে প্ররোচিত করেছেন এবং অবিশ্বাসীদের খুন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কি আল্লা পেশাদার খুনী ছিলেন যাকে ভাড়া করে মহম্মদ দল তৈরী করলেন? মুসলমানদের নতুন করে ভাবতে হবে, যাঁকে আল্লা বলছি তাঁর প্রকৃত স্বরূপটা কি? তিনি কি সত্যিই মঙ্গলময় ঈশ্বর নাকি হিংসার বীজ বপনকারী এক মহাদস্যু? যাদের ধর্মের প্রতিপালককে এইরূপে দেখানো হয় সে ধর্ম কি মানুষের মুক্তির কথা বলতে পারে? সে ধর্ম কি মানবতার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম? সে ধর্ম কি সত্য সমাজে গ্রহণযোগ্য?

◘ "এবং আল্লাও ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যেই আল্লাই শ্রেষ্ঠ।"

● সূরা আনফাল/ আয়াত ৩০

বাক্যটি আয়াতের শেষাংশ। এই আয়াতে আল্লা নিজেকে একজন ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইসলাম অগণতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিকতাশূন্য। ধ্বংসকারী কোন মতবাদের বিরুদ্ধে সাহসী ন্যায়বাদী মহাপুরুষ কথা বলবেনই। তাই ইসলামের মতো পরধর্মবিদ্বেষী, অসহিষ্ণু, আদর্শবিহীন মতবাদের বিরুদ্ধে মানুষ যাতে কথা বলার সুযোগ না পায় তার জন্যই আল্লার ষড়যন্ত্র। এবং এইভাবে ষড়যন্ত্র করেই ইসলামকে সমাজে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাই স্বাভাবিক কারণে আল্লাই শ্রেষ্ঠ ষড়যন্ত্রকারীর পুরস্কারটা পেয়েছেন।

◘ "হে নবী! বিশ্বাসীদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর।"

● সূরা আনফাল/ আয়াত ৬৫

আলোচ্য অংশটুকু আয়াতটির প্রথম বাক্য। এখানে আল্লা পরমপিতা হয়েও তাঁর বান্দাদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং অবশ্যই অমুসলমানদের বিরুদ্ধেই। অর্থাৎ আল্লা চাইছেন যে, পৃথিবী থেকে অমুসলমান নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। এমন পক্ষপাত দুষ্ট, অমুসলমান বিরোধী আল্লাকে কি ভগবান বলা যায়? সুস্থ, মানবিক মূল্যবোধপূর্ণ সমাজে আল্লার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তবে যে ইসলামের অর্থ বলা শান্তি? যাদের প্রতিপালক স্বয়ং অশান্তির বীজ বপন করেছেন সেই গোষ্ঠীর মুখে কি শান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ

মানায়? ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতেই আমরা অনেক শান্তির নিদর্শন পাচ্ছি যারা স্বজাতির মধ্যেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। তাই কোরাণ সম্মত মুসলমান যুদ্ধবাজ, অশান্তিপ্রিয় এবং সুস্থতার পরিপন্থী হবেই।

◘ "মহান হজ্বের দিনে আল্লা ও তাঁর রসুলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এ এক ঘোষণা যে আল্লার সাথে অংশীবাদীদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তাঁর রসুলের সঙ্গেও নয়।"

● সূরা তওবা/ আয়াত ৩

বাক্যটি আয়াতের প্রথমাংশ। আল্লা স্বয়ং বলেছেন যে তাঁর সঙ্গে মূর্তিপূজক অর্থাৎ হিন্দুদের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লা যদি জগৎস্রষ্টা জগতের প্রতিপালক হন তবে তো সকলের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক থাকা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় ভগবান নিজমুখে বলেছেন যে, 'যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি সেভাবেই অনুগ্রহ করি। এই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ। তবে আল্লার বক্তব্যে এত পক্ষপাতিত্ব কেন? তাহলে কোরাণে বর্ণিত আল্লা কে? সর্বধর্ম খিচুড়ী নির্মাতাদের মুস্কিল হয়ে গেল, "যে আল্লা সেই রাম, ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম"- এইসব অসার বাক্যগুলো যে কত মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যায়। আশা করি এতদিন আল্লা ভগবানের মিলন ঘটিয়ে যারা ভন্ডামী করে এসেছেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান এবার কিছুটা ফিরবে এবং সত্য বলার সাহস জন্মাবে।

◘ "তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি অবশ্যই ধ্বংস করেছি।"

● সূরা ইউনুস/ আয়াত ১৩

এ আয়াতটিও কোরাণের বহু জায়গায় আছে। মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার জন্য আল্লার এত প্রবণতা কেন? তবে কি তাঁকে জগতের দয়ালু, মঙ্গলময় প্রতিপালক বলা চলে? আল্লা কি দস্যু? আর কোরাণের বহু জায়গায় এই একই কথার পুনরাবৃত্তি কেন, আসলে আল্লা ভয় দেখিয়ে মানুষকে ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করাতে চান। 'অবশ্যই' শব্দটা তাঁর কুকার্যকে বিশেষ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং একই সঙ্গে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করছে। যে ধর্মের প্রতিপালক অসুর স্বভাবের, ধ্বংসকারী, আতঙ্কময় সেই ধর্মকে কি জগতের কল্যাণকামী বলা যাবে?

◘ "যখন মুসা আগুনের নিকট পৌছালো তখন উপত্যকার ডান পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহ্বান করে বলা হলো, হে মুসা! আমি আল্লা, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"

● সূরা ক্বাসাস/ আয়াত ৩০

মুসাকে আল্লা গাছ থেকে ডাকলেন। আল্লা তো নিরাকার, বিশ্বব্যাপী তাঁর অবস্থান, কখনই তিনি অংশী হতে পারেন না তবে একটা গাছের ডালে নিজেকে কি করে সঙ্কুচিত করলেন? তবে বলতে পারি আল্লা নিশ্চয় আকার ধারণ করতে পারে অথবা আল্লা মহম্মদের গার্জেনস্বরূপ এক ব্যক্তিমাত্র। তাহলে ইসলামে নিরাকার আল্লার কথা যে বলা হয় তা নিরর্থক এবং অংশীবাদীদের প্রতি বিদ্বেষও বাতুলতা মাত্র।

◘ "গুরু শাস্তির পুর্বে ওদের আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব যাতে ওরা আমার দিকে ফিরে আসে।" **● সূরা সিজদাহ/ আয়াত ২১**

আয়াতটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লা কি থানার দারোগা? দারোগা যেমন অপরাধী ব্যক্তিকে স্বীকারোক্তির জন্য প্রথমে অল্প শাস্তি ও পরে কঠিন সাজা দিয়ে থাকে, আল্লাও দেখছি মানুষকে নিজদলে টানার জন্য এইপ্রকার শাস্তির ব্যাবস্থা করেছেন। এখানেও দেখছি, ভক্তি নয়, ভালবাসা নয় শুধু ভীতি-আতঙ্কের মাধ্যমে আল্লা দল তৈরী করতে চান। ইসলাম সৃষ্টির প্রথম থেকেই হিংসা, হানাহানি আর সংহারের মধ্য দিয়ে এক অশান্তিময়, অমানবিক ও আধ্যাত্মবিহীন রাজ কায়েম করে চলেছে। তাই ইসলাম সম্বন্ধে মন্তব্য করার পূর্বে তার পবিত্র কোরাণের এই আয়াতগুলি অবশ্যই বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে।

◘ "আল্লার শাস্তির বিরুদ্ধে ওদের সাহায্য করার জন্য ওদের কোন অভিভাবক থাকবে না।" **● সূরা শূরা/ আয়াত ৪৬**

আল্লা অবিশ্বাসীদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন। যেহেতু আল্লা একজন ধ্বংসকারী তাই অবিশ্বাসীদের অভিভাবকদের ধ্বংস করার ক্ষমতা তিনি রাখেন। সত্যিই তিনি জগতের প্রতিপালক বটে! তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় আল্লার যারা অনুগামী নয় তারা পর্যন্ত কি শাস্তি পেল? বরং আজ অমুসলমানরাই জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। তাহলে বলতে হয় যে এদের অভিভাবকের সঙ্গে আল্লা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পারেননি। তাই হিংসা দ্বারা, বিভেদ মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত আল্লার অনুগামীরা মেরে কেটে হয়তো পৃথিবীর অনেক জমি লুট করতে পেরেছে কিন্তু মান, যশ, প্রতিষ্ঠায় জগতের কল্যাণ প্রচেষ্ঠায় ঐ অবিশ্বাসীরাই শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল। শুধু ভয় দেখিয়ে মুসলমান তৈরী করা যায় কিন্তু মানুষ তৈরী করা যায় না।

◘ "স্মরণ রেখো, দুটি ফেরেশ্‌তা তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে।"
● সূরা ক্বাফ/ আয়াত ১৭

ফেরেস্তারা লিপিবদ্ধ করুক আপত্তি নেই কিন্তু যেহেতু আল্লার উভয় পার্শে বসে তারা ডিউটি করছে অতএব আল্লার নিশ্চয় একটা আকার আছে, যার দক্ষিণে ও বামে বসা যায়। তবে তো আল্লাও অংশী হয়ে গেছেন। তাহলে আল্লার স্বরূপ কি নিরাকার না আকার? যদি নিরাকার হয় তবে এ ধরণের আয়াতের অর্থ কি? আর যদি আকার হয় তবে তো ইসলামের আসল তত্ত্বই মিথ্যা। গোটা ব্যাপারটা কি মহম্মদের কল্পনায় তৈরী করা? তাই মাঝে মাঝে কিছু বিপরীত কথাবার্তা পরিলক্ষিত হচ্ছে? দেড় হাজার বছর ধরে একটা মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে চলেছে গোটা মুসলমান সমাজ। ভয় এবং ধর্মান্ধতায় মিথ্যাকে সংশোধন করার সাহস নেই।

◘ "ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে দণ্ডায়মান হবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে ঊর্দ্ধদেশে।" **● সূরা হাক্ক্বাহ/ আয়াত ১৭**

এঘটনা ঘটবে কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন। আরশ হচ্ছে আল্লার আসন। কেয়ামতের দিন ফেরেশতারা এই আরশকে উপরের দিকে ঠেলে তুলবে। আসনের নিশ্চয় একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে এবং সেই আসনে নির্দিষ্ট আকারের কোন বস্তুকেই রাখা যায়। যেহেতু এই আরশ বা আসনে আল্লা উপবেশন করেন অতএব আল্লার অবশ্যই একটি

নির্দিষ্ট আকার থাকাই স্বাভাবিক। আল্লা নিরাকার, অংশী হন না- এই তত্ত্বটি কি তাহলে টিকতে পারে?

▫ **"রসুল্লাহ বললেন, কেয়ামতের দিন এই রকমই নির্বিঘ্নে তোমরা আল্লাতাল্লাকে দেখতে পাবে।"** **• হাদীস / ৬৯৬ বুখারী**

মহম্মদ তাহলে নিজমুখেই স্বীকার করলেন যে আল্লার আকার আছে এবং কেয়ামতের দিন তাঁকে এই চর্মচক্ষে দেখা যাবে। তবে 'আল্লা যে নিরাকার' এই মিথ্যা বাণী অবতারণার কি প্রয়োজন ছিল? "আল্লা কখনই অংশী হন না" এই তত্ত্ব কি মহম্মদ প্রচার করেছিলেন শুধু একটা গোষ্ঠী তৈরীর অভিপ্রায়ে। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধর্ম সঠিক ধারণা দিতে পারে না তাকে গ্রহণ করা উচিত?

▫ **"আল্লাতালা আদমকে তাঁর দৈহিক গঠনের আকারের উপর সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর দৈর্ঘ্য বা দেহের উচ্চতা ষাট হাত ছিল।"** **• হাদীস / ৭১৬ বুখারী**

আল্লা যখন প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন নিজের আকৃতিতে, তখন তাহলে আল্লার নিজস্ব একটা আকার ছিল এবং তা ছিল ষাট হাত লম্বা। মাথা, মুখ, হাত, পা প্রভৃতি সব কিছুই ছিল তবে তো আল্লার নিরাকার রূপ মিথ্যে হয়ে যায়। মহম্মদের আমল থেকে রূপ কি বদলে গেছে? আদমতুল্য আল্লা এবং মহম্মদ বর্ণীত আল্লা কি পৃথক ব্যক্তি? এখনও কি আল্লাতালা ষাট হাত লম্বা ?

▫ **"আদম বললেন, আল্লাতালা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্য 'তৌরাত' গ্রন্থ লিখে রেখেছেন।"** **• হাদীস / ৭২৭ বুখারী**

আদমের জন্মানোর চল্লিশ বছর আগে যদি গ্রন্থ রচনা হয়ে থাকে তবে আল্লা কিভাবে তা রচনা করলেন? নিশ্চয়ই তাঁর হাত অর্থাৎ আকার ছিল। আচ্ছা সে গ্রন্থ লিখে কোথায় রেখেছিলেন? লেখার সামগ্রী কোথায় পেলেন? যাই হোক বর্তমান আলোচনার শেষে হাদীসের এই বাণীটিও প্রমাণ করে যে আল্লা আকার ধারণ করতে পারেন অথবা আল্লা আকৃতি বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি। এই মিথ্যা সংশয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে ইসলাম তা কত অন্তঃসারশূন্য কত আজগুবি- আল্লার প্রকৃত স্বরূপ কি তা উপরোক্ত আয়াতগুলোর আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। ধর্মান্ধ মুসলমানদের, ভণ্ড সর্বধর্ম সমন্বয়কারীদের ধারনা কত ভ্রান্ত কত অবাস্তব, বর্তমান আয়াতগুলোর আলোচনা থেকে আশাকরি পরিষ্কার হয়ে গেল। 'আল্লা ও ভগবান' এক নয় এই সরল সত্য কথাটা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। বিশ্বাস রাখি আর কোন নির্বোধ বাতুল ব্যাক্তি সর্বধর্মের খিচুড়ি তৈরী করার মিথ্যে স্বপ্ন দেখবেন না।

অযৌক্তিক – পরস্পরবিরোধী

কোরাণ ও হাদীসে এমন কতগুলো বাক্য আছে যার মধ্যে কোন বাস্তবের ছোয়া নেই। কিছু কথা ভীষন পরস্পরবিরোধী। আবার কিছু বাক্য আছে যা বুদ্ধির বাইরে। একমাত্র সাবধানী পাঠকের চোখেই এই ভ্রম ধরা পড়া সম্ভব। কোরাণকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। কোরাণের অনুগামীরা এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি কথাকেই অভ্রান্ত জ্ঞানে অনুসরন করে, তাই হয়তো যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে সব আয়াতগুলোর সুস্পষ্ট বিশ্লেষন করার প্রয়োজন মনে করে না। হয়তো দেড় হাজার বছর আগে কিছু অবাস্তব কল্পনার অবতারণা

করে মানুষের মনে বিশ্বাস জাগানো সম্ভবপর হতো; কিন্তু বর্তমান সভ্য ও শিক্ষার জগতে কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাঁর পেছনে জোরালো যুক্তি থাকা প্রয়োজন। কোরাণের যে আয়াতগুলো ও যে হাদীসগুলো অযৌক্তিক বা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য মনে হয়েছে তাঁর মধ্যে থেকে কয়েকটিকে নিয়ে বিশ্লেষণ করা হল পাঠক নিরপেক্ষ ভাবে যুক্তি বুদ্ধির আলোকে বিচার করবেন আশা রাখি।

◘ "অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং ..." • সূরা আরাফ/ আয়াত ২০

আলোচ্য আয়াতটি এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হলো, আল্লা আদম ও তার সঙ্গিনীকে বৃক্ষের ফল খেতে বারণ করেছিলেন এবং তাদের লজ্জাস্থান বা বাস্তব সম্পর্কে কোন জ্ঞান দেওয়া হয়নি। অতঃপর শয়তান তাদের বৃক্ষের ফল খেতে পরামর্শ দেওয়ায় তারা ফল খায় এবং জ্ঞানের উন্মেষ হয়। এখানে কতগুলো প্রশ্ন স্বভাবতঃ এসে পড়ে। আল্লা সর্বপ্রথম আদমকে সৃষ্টি করেন এবং তার পাঁজরার একটি হাড় দিয়ে তৈরী হয় তার সঙ্গিনী। তবে শয়তান কে সৃষ্টি করলো? আল্লা কি তবে সর্বস্রষ্টা নয় ? আর আদমকে জ্ঞানফল খেতে কেন বারণ করা হয়েছিল? আল্লা চেয়েছিলেন আদমকে অজ্ঞান করে রাখতে তাই শয়তান যদি আদমকে জ্ঞানের সন্ধান দিয়েই থাকে তবে সে অন্যায়টা কোথায় করলো?

◘ "স্বর্গ নরকের মধ্যে পর্দা আছে। মধ্যস্থলের প্রাচীরে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে এবং স্বর্গবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।" • সূরা আরাফ/ আয়াত ৪৬

স্বর্গ নরকের মধ্যে প্রাচীর কে তৈরী করল? ওখানে যারা আছে তাদের এপয়েন্টমেন্ট কে দিয়েছেন? যেহেতু তারা কথা বলে অতএব তারা মানুষ! ঐ মানুষগুলোর পাপ-পুণ্যের বিচার হবে না? কিয়ামতের সময়তো ওদের ডিউটি, তার আগে ওরা কি কাজ করবে নাকি শেষ বিচারের দিনই ওদের আনা হবে এ বিষয়ে আল্লা পরিষ্কার করে কিছুই বললেন না।

◘ "এবং আরও স্মরণ করো, আমি পর্বতকে তাদের উর্ধে স্থাপন করি।"

• সূরা আরাফ/ আয়াত ১৭১

আলোচ্য আয়াতটির পূর্বে আয়াত থেকে জানা যায় যে যারা প্রকৃত মুসলমান, আল্লা পাহাড়কে তাদের ওপরে স্থাপন করেন। আল্লা যখন পৃথিবী এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয় সৃষ্টি করেছেন তখনই তো পর্বত সৃষ্টি হয়ে গেছে; তবে মুসলমান জন্মানোর পর নতুন পর্বত কিভাবে তৈরী হলো? তাছাড়া পর্বত মানুষের ওপরে কিভাবে স্থাপিত হয়? একটা ধর্মগ্রন্থে এরকম মন্তব্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

◘ "অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত নই।" • সূরা হূদ/ আয়াত ৩১

◘ "এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করছি।"

• সূরা ইউসুফ/ আয়াত ১০২

প্রথম আয়াতটির উদ্ধৃত বাক্যটিতে মহম্মদ অদৃশ্য সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন আবার দ্বিতীয় আয়াতটিতে অদৃশ্যলোকের সংবাদ পরিবেশন করলেন। দুটি কথাই

পরস্পর বিরোধী। আল্লার ওহী (প্রত্যাদেশ) দ্বারাতো তিনি অদৃশ্য জগতের খবর পাচ্ছেন, তবে প্রথমে ঐ কথা বলার দরকার কি ছিল? আল্লার রসুল যদি এক এক জায়গায় এক এক রকমের কথা বলেন তবে তো সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি আসবেই এবং মহম্মদ প্রকৃত রসুল ছিলেন কিনা বা তাঁর প্রতি আল্লার বাণী প্রেরিত হতো কিনা এ বিষয়েও ঘোর সংশয় থেকে যাচ্ছে।

◘ "আমি তো ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি।"

● সূরা হিজর / আয়াত ২৬

◘ "তিনি তো মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

● সূরা ফুরফান / আয়াত ৫৪

◘ "ওদের আমি আঠালো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।"

● সূরা সাফফাত / আয়াত ১১

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে আমরা দেখলাম যে আল্লা মানুষ সৃষ্টি করার ব্যাপারে তিনরকম ফরমূলার কথা বলেছেন। প্রশ্ন জাগে, তবে কি আল্লা তিন রকমের মানুষ তৈরী করেছেন অথবা তিন শ্রেনীর মানুষকে তিনজন আল্লা তৈরী করেছেন যার ফলে তৈরী উপাদান তিনরকম হয়েছে! আল্লা যদি পরমেশ্বর হন তবে তাঁর এমন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য কেন? আর যে গ্রন্থ এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নানান মন্তব্য করে তবে তাঁর থেকে সত্য কিভাবে জানা যাবে? কোরাণের কাছে মানুষ এমন বিভ্রান্তিমূলক বাক্য ছাড়া আর কি পাবে? তাহলে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে আস্তে পারি। হয় 'আল্লা' কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয় নতুবা আল্লা মানুষ সৃষ্টি করেননি।

◘ "সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকেও অংশী না করে।"

● সূরা কাহাফ / আয়াত ১১০

আলোচ্য বাক্যটি আয়াতের শেষাংশ। এখানে প্রতিপালক অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে 'সাক্ষাৎ' এর কথা বলা হয়েছে। সাক্ষাৎ তো আর শূন্যের সাথে হয় না তবে নিশ্চয় আল্লা আকৃতি বিশিষ্ট হবেন বান্দাকে খুশী করার জন্য। অর্থাৎ মূর্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। আবার শেষে বলা হয়েছে 'কাউকেও অংশী না করে'- এ কথাটা কিন্তু আর খাটে না কারণ আল্লা নিজে প্রয়োজনের তাগিদে অংশী হচ্ছেন তবে অংশীর উপাসনার বাধা কি? একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে কোরাণ কি সত্যিই পরমেশ্বরের প্রত্যাদেশ নাকি কোন অসাবধানী লেখকের রচনা?

◘ "অতঃপর আল্লা যখন তোমাদের মৃত্তিকা হতে ওঠার জন্য আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে।" **● সূরা রূম / আয়াত ২৫**

এটা এক অযৌক্তিক মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মানুষকে কবর দেওয়ার পরই ক্রমশঃ তার নিষ্প্রান দেহটা নষ্ট হতে শুরু করে এবং অবশেষে মাটিতে পরিনত হয়। কিয়ামত যে কবে হবে তার কোন ইঙ্গিত নেই। ততদিন ঐ দেহগুলো মাটির তলায় অপরিবর্তিত থাকবে- এটা বিশ্বাসযোগ্য? তাছাড়া আল্লা ডাকলেই তারা মাটি ভেদ

করে পাখা মেলে আল্লার কাছে ফিরে যাবে? বিংশ শতাব্দীর মহাকাশের যুগে এরকম রূপকথা বিশ্বাস করে সেই মতবাদের অনুগামী হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত?

◘ "আল্লাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জীবনোপকরন দিয়েছেন, তিনিই মৃত্যু ঘটাবেন আবার জীবিত করবেন। তোমাদের দেবদেবী সমূহের এমন কেউ আছে কি যে এ সমস্তের কোন একটি করতে পারে?" ●সূরা রূম / আয়াত ৪০

আল্লা যে নিজের সৃষ্টি বলে দাবী করেছেন তার কি কোন জ্বলন্ত প্রমাণ আছে? হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সব সৃষ্টি করেন এবং পালনকর্তা বিষ্ণু সকলকে পালন করেন অর্থাৎ হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী দেবদেবীরাও জন্মমৃত্যুর ঘটনা ঘটাতে পারেন। ঐ দেবদেবীরা কিন্তু অন্য ধর্মের উপাসকের কাছে তার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন না। তবে আল্লার এই পরাশ্রীকাতরতা কেন? আল্লা সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন এ যেন মুসলমানদের শুধু বিশ্বাস অতএব অপর ধর্মাবলম্বীদের অন্য বিশ্বাস থাকতে পারে এটাই স্বাভাবিক। তারজন্য আল্লার এই চ্যালেঞ্জ রূপ মানসিকতা মোটেই তাঁকে ঈশ্বরের আসনে বসাতে পারে না।

◘ "যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখনই মানুষ কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে।" ● সূরা ইয়াসীন / আয়াত ৫১

সিঙ্গায় কে ফুৎকার দেবে এ কথা কিন্তু বলা হয়নি। আশা করি আল্লা অথবা তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ফেরেশতা এ কাজ করে থাকবেন। মাটির নীচে বিশ্বাসীগণ (ধরে নিলাম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বেঁচেই থাকবে) কি শিঙ্গার আওয়াজ শুনতে পাবে। মাটি ভেদ করে কোন আওয়াজ যেতে পারে না। আবার শিঙ্গা বাজান হবে কিয়ামতের দিন। কবরের তলায় আল্লার বান্দারা কি বেঁচে থাকবে? এটা কি যুক্তিসঙ্গত? তারপর শিঙ্গায় আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ভেদ করে উঠে চলে আসবে। এরকম অবিশ্বাস্য হাস্যকর মন্তব্য শিক্ষিত মানুষ যুক্তি বুদ্ধির আলোয় কিভাবে মেনে নিতে পারে?

◘ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তিনি ছ'দিনে সৃষ্টি করেছেন।"
● সূরা আরাফ / আয়াত ৫৪

◘ "তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।"
● সূরা হবা মীম সিজদাহ / আয়াত ৯

পাঠক আয়াত দুটি লক্ষ করুন। ওপরের আয়াতে বলা হলো 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী' ছয়দিনে সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে দেখছি আল্লা দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী নিশ্চয় আল্লা একত্রে সৃষ্টি করেছেন। তবে দুরকম সময় কেন? আল্লা কি দুটি? আল্লা কি দুটি পৃথিবী তৈরী করেছেন? তাহলে আর একটা কোথায় রাখলেন? এমন পরস্পরবিরোধী আয়াত যে ধর্মগ্রন্থে লেখা থাকে তা কি মানুষকে সত্যের পথ দেখাতে পারে?

◘ "বলো তোমরা আল্লার পরিবর্তে যাদের ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে ওদের অংশ আছে কি? এর সমর্থনে পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা উপস্থিত কর।" ● সূরা আহ্‌ক্বাফ / আয়াত ৪

আল্লা নিজে কিছু সৃষ্টি করেছেন কিনা প্রমাণসহ দেখাতে পারেন? এটাও যেমন নিছক মুসলমানদের বিশ্বাস মাত্র তেমনি আমরা বিশ্বাস করি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সবই সৃষ্টি করেছেন। আল্লা প্রদত্ত গ্রন্থ তো কোরাণ এবং তার বয়সতো এখনও দেড় হাজার বছরই পূর্ণ হয়নি। কিন্তু আমাদের বৈদিক মুনিঋষিরা দশ হাজার বছর আগে ঐশ্বরিক জ্ঞান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে গীতার বাণী বলে গেছেন যা আজ বিশ্বের পণ্ডিতবর্গের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় ভগবান জগতের মানুষের প্রকৃত কল্যাণের কথা বলে গেছেন যা অনুসরণ করলে মানুষ সৎকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে মনুষ্যপ্রাপ্ত হয়, যা অবশেষে তাকে ব্রহ্মত্বে সামিল করে। তাহলে মহান আল্লার চ্যালেঞ্জস্বরূপ বাণীটি অযৌক্তিক হয়ে যায় না কি?

▫ "যে ব্যাক্তি আল্লা পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাকে কিয়ামতের দিন পর্য্যন্ত ডাকলেও সাড়া দেবে না তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?"

• সূরা আহ্কাফ / আয়াত ৫

আল্লা নিজেই এখানে বিভ্রান্তিকর কথা বলেছেন। দেবদেবীদের ডাকলে তাদের সাড়া পাওয়া যায় না একথা তাঁকে কে বলেছেন? হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে এমন বহু উদাহরণ আছে। রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'দেখেছি কিরে, তার সঙ্গে কথা বলেছি।' আমরা বিশ্বাস করি মনপ্রাণ দিয়ে ভোগের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ভগবানকে ডাকলে তিনি এই মাটির পৃথিবীতে নেমে আসেন। মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন এটা শুধু নিছক বিশ্বাসই নয়, এর সমর্থনে বহু নিদর্শন আমাদের হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। তাই আল্লার এমন একদেশদর্শী মনোভাব কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।

▫ "আল্লাতালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির হাজার বছর আগে সুরা ত্বাহা ও সুরা ইয়াসীন পাঠ করেছিলেন।" **• হাদীস ২য় খন্ড / বাণী ১৬৭ মিশ**

▫ "আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দুহাজার বছর আগে আল্লাতালা একটা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।" **• হাদীস ২য় খন্ড / বাণী ১৫৮ তির**

হাদিস দুটি বড়ই অযৌক্তিক। কোরাণ তো রচনা হয়েছে দেড় হাজার বছরও হয়নি তবে আল্লা সুরা দুটো তার আগে পাঠ করলেন কি করে? আকাশ পৃথিবী সৃষ্টির দুহাজার বছর আগে লেখার সামগ্রী কোথা থেকে আসবে? আবার সুরা পাঠ করার কথা যখন বলা আছে তখন নিশ্চয় পাঠকের মুখ ছিল অর্থাৎ দৈহিক আকৃতি ছিল। অতএব সেই দেহের নিশ্চয় কোন অবস্থান ছিল। তাহলে আকাশ পৃথিবী সৃষ্টির আগে তিনি কোথায় অবস্থান করতেন? তবে কি আলাদা কোন পৃথিবী ছিল নাকি আল্লার আগেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে গেছে? সম্পুর্ণ ব্যাপারটাই অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য।

▫ "রসুল্লাহ বলেছেন, মক্কায় থাকাকালে একদিন রাতে যে ঘরে আমি শুয়েছিলাম সেই ঘরের ছাদ খুলে গেল তারপর ঐ পথে জিব্রাইল নেমে এলেন। তারপর আমার বুকখানা চিরে ফেলে ওকে জমজমের পানি দিয়ে পরিষ্কার করা হোল। তারপর পরিপক্ক সত্যকার জ্ঞান ও ঈমান বৃদ্ধিকারী বস্তুকে পরিপূর্ণ একটা সোনার পাত্র এনে তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হোলো।" **• হাদীস / বাণী ৫৫৭ বুখারী**

পাঠক মনোযোগ সহকারে হাদীসটি পড়ুন তারপর আপনার বিচার বুদ্ধি দিয়ে এক বিশ্লেষণ করুন। কত যুক্তিহীন ও বাস্তব বহির্ভূত বক্তব্য। ঘরের ছাদ কখনও খুলে যায় না ভেঙ্গে নীচে পড়ে। রসুল্লাহ নিজেই বলেছেন যে তিনি বেঁচে রইলেন কি করে? জিব্রাইল কি একজন সার্জেন ছিলেন? 'জ্ঞান ও ঈমান বৃদ্ধিকারী বস্তু' কি দোকানে কিনতে পাওয়া যায় যে ওগুলো সোনার পাত্রে ভরে বুকের মধ্যে পুরে দেওয়া হোল আর অমনি ঐ ব্যাক্তি জ্ঞানী হয়ে গেল। রসুল্লাহ এরকম জ্ঞান কয়েক কুইন্টাল আমাদের দেশে রপ্তানি করতে পারতেন তাহলে এদেশে অবিশ্বাসী মূর্খেরা জ্ঞানের ইঞ্জেকশান নিয়ে আপনার মতোই ইমানদার হয়ে উঠত। এত কষ্ট পয়সা খরচ করে আর লেখাপড়া শিখতে হোতো না।

◘ **"যে ব্যক্তি আল্লার দেওয়া ধনের জাকাত আদায় করে না, পরলোকে ঐ ধন বিষধর সর্পের আকার ধারণ করে দু'গাছা মালার মতো তার কণ্ঠ বেষ্টন করবে। তারপর তার মুখের উভয়দিকে বেষ্টন করে বলবে, আমি তোমার ধন, আমি তোমার ধনাগার।"**

● হাদীস / বাণী ৬৫০ বুখারী

সম্পত্তির কিছু দান করা অবশ্যই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু দান না করলে সেই ধন কি করে বিষধর সর্পের আকার ধারণ করতে পারে এবং সেই পাপ বুকে ভর দিয়ে পরলোক যাবে? সব থেকে বড় অযৌক্তিক হোল যে সাপ কথা বলবে। সাপের প্রাণ আছে, সে প্রাণী, কিন্তু সে মানুষের সাথে কথা বলার এরকম একটা অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য মন্তব্য হাদীস হিসাবে কিভাবে স্বীকৃতি পায়?

◘ **"সর্বপ্রথম আল্লাতালা কলমকে সৃষ্টি করলেন এবং বললেন, 'লেখ'। কলম বলল কি লিখব? তিনি বললেন- তক্‌দির লেখ।"** **● হাদীস / বাণী ৬৬৬ তির**

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে মানুষ যখন অসভ্য ছিল, তখন তারা লেখাপড়া জানত না অর্থাৎ সে সময় কলমের ব্যাবস্থা ছিল না বরং লেখা পড়ার ব্যাপারটা অনেক পরেই এসেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবী আগে সৃষ্টি হোলো তারপর মানুষ ইত্যাদি। তবে আল্লার সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির ঘোষণাটা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে নাকি? তাছাড়া কলম আবার কবে কথা বলতে শিখলো? কলমের প্রাণ আছে কোন বৈজ্ঞানিকেরও তো জানা নেই। নাকি আল্লার কলম বলে সজীব? মুসলমানেরাই উত্তরটা দিক।

অবৈজ্ঞানিক

ধর্ম সত্য পরিবেশন করে, কোন রূপকথার গল্প নয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যাকে সত্য বলা হবে সেটাই ধর্ম। একথা কখনও বলতে চাই না যে, বিজ্ঞান বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছে তাই তার বাইরে আর কিছু নেই কিন্তু বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত যেটুকু সত্যকে আবিষ্কার করতে পেরেছে তার সম্বন্ধে আর কোন দ্বিতীয় কথা চলে না। বেদে পুষ্পক রথের কথা পাই, পুরাণে পাই নারদের ঢেঁকির কথা, এগুলো মিথ্যে একথা বলা যায় না, কারণ বিপক্ষে কোন যুক্তি নেই বরং তৎকালীন যুগে হয়তো আরও উন্নত ধরণের বিজ্ঞান ছিল একথা এখন অনেকেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আজ যদি বলা হয় পৃথিবী স্থির তবে সেটা অবশ্যই হবে অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য কারণ বিজ্ঞান ইতিমধ্যে এই সত্যকে প্রমাণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। কোরাণের মধ্যে বেশ কিছু আয়াত পাই যা

অবৈজ্ঞানিক এবং এই মহাকাশের যুগে সেইসব মিথ্যা বর্ণনাকে মেনে নেওয়া যায় না কারণ বিজ্ঞান আমাদের উপযুক্ত তথ্য দ্বারা সত্যের স্বপক্ষে প্রমাণ রেখেছে। ইসলাম সৃষ্টি হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর হতে চললো, তখনকার কোরাণের কথা আজও অভ্রান্ত হবে এটা কি করে হতে পারে? যে ধর্মকে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায় না সেটা স্থিতিশীল অবৈজ্ঞানিক; বর্তমান সমালোচনায় সেই প্রকৃতির কিছু আয়াত নিবেদন করা হোলো।

◘ "যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পাণি বর্ষণ করে তাদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনেশুনে কাউকেও আল্লা সমকক্ষ দাঁড় করিও না।"

● হাদীস / বাণী ৬৬৬ তির

বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রায় তিনশো কোটি বছর পূর্বে মহাশূন্যে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের দরুন পৃথিবীর সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ ঠাণ্ডা ও ভারী হয়ে পৃথিবীর ভূমি সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বিজ্ঞান আমাদের এটাও শিখিয়েছে যে দিবাভাগে জলাশয় থেকে জল বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে ক্ষুদ্র জলকণার আকারে বায়ুমণ্ডলে ভাসতে থাকে। ঘনীভবনের ফলে ঐ জলকণা ঠান্ডা ও ভারী হয়ে নীচের দিকে বৃষ্টির আকারে নেমে আসে। আর মহাশূন্য কোন কঠিন বস্তু নয় যা ছাদ হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে।

◘ "লোকে তোমাকে নতূন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (কেন তা বাড়ে এবং কমে) বলা হয় উহা লোকের কাজকারবারের এবং হজ্বের সময় নির্দেশক।"

● সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ১৮৯

নতুন চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি দেখে পৃথিবীর মানুষ কোন কাজের রুটিন করে নিতে পারে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তার মানে হজ্বের সময় নির্দেশ করার জন্য চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি এটা মেনে নেওয়া যায় না কারণ পুরো ব্যাপারটাই বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত।

◘ "তিনিই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন।"

● সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ৬৭

সূর্য্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর এই আবর্তনকালে তার যে অংশ সূর্য্যের সামনে থাকে সেই অংশে দিন ও বাকী অংশে রাত হয়। কথাটা বিজ্ঞানীদের, যা নিষ্ঠুর সত্য। তাহলে আল্লা যে আমাদের কর্ম ও বিশ্রামের জন্য দিনরাত সৃষ্টি করেছেন এটা হাজার বছর আগে বিশ্বাস করা যেত কিন্তু বর্তমান যুগে এ কথা মেনে নেওয়া যায় কি?

◘ "আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দিই তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বার করি।"

● সূরা হজ্ব / আয়াত ৫

আলোচ্য অংশ আয়াতটির একটি বাক্য। আয়াতটিকে বলা হচ্ছে যে আল্লা ইচ্ছামত মাতৃগর্ভে শিশু সৃষ্টি করেন তারপর তাকে সেখান থেকে বার করে দেন। কিন্তু বিজ্ঞান বলছে যে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলনের ফলেই ভ্রূণ বা জাইগোট তৈরী হয় এবং মাতৃগর্ভে ক্রমাগত কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ভ্রূণ নির্দিষ্ট মানবশিশুতে রূপান্তরিত হয় এবং 'ক্রোমোজোম' নামক বস্তুটি আকৃতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২৮০ দিন মাতৃগর্ভে অতিবাহিত করে শিশু ভূমিষ্ট হয়। অতএব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটাকে আল্লার কাজ বলে চালিয়ে

দেওয়া যায় কি? তাছাড়া ভগবান নিজে কিছু করেন না মানুষ কর্ম করার জন্যই পৃথিবীতে আসে।

◘ "কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদের আল্লা পুনরুত্থিত করবেন।" **● সূরা হজ্ব / আয়াত ৭**

মানুষ যখন মরে তখন আস্তে আস্তে তার দেহের সমস্ত কোষ মৃত হয়ে যায় যার ফলে দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সম্পুর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ে এবং দেহ অবশেষে নষ্ট হয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কিয়ামত কবে হবে ঠিক নেই। হাজার হাজার বছর আগের মৃতদেহগুলোর কবরের নীচে অবিকৃত অবস্থায় থাকা কি সম্ভব নাকি মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া অবস্থাগুলো আবার নিজরূপে ফিরে এসে বিচারের জন্য বিচারের জন্য আল্লার দরবারে ধাওয়া করে? এটা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, হাস্যকরও বটে। যে গ্রন্থ এমন অবৈজ্ঞানিক আয়াত প্রণয়ন করে মহাকাশের যুগে বিচারবুদ্ধির আলোয় তাকে কি গ্রহণ করা সম্ভব? তাই বিজ্ঞান যেমন ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি ধর্মও বিজ্ঞান ছাড়া চলতে পারে না।

◘ "আল্লাহ্ সমস্ত জীবের পা সৃষ্টি করেছেন। ওদের কিছু বুকে ভর দিয়ে চলে, কিছু দু'পায়ে চলে এবং কতক চারপায়ে। আল্লা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

● সূরা নূর / আয়াত ৪৫

বিজ্ঞানী ডারউইনের বিবর্তনবাদ থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রথম সৃষ্টি হল উদ্ভিদ তারপর 'প্রোটোজোয়া' নামক এককোষী প্রানী। সর্বশেষে সৃষ্টি হল স্তন্যপায়ী অর্থাৎ মানুষাদি প্রানী। 'পায়ে'র সৃষ্টিটাও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে এটা বিজ্ঞানসম্মত, তাই আল্লা জীবের 'পা' সৃষ্টি করেছেন এ দাবীটা খুবই দূর্বল এবং কখনই সমর্থন যোগ্য নয়।

◘ "তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ কিন্তু সেদিন ওরা হবে মেঘপুঞ্জের মত চলমান।" **● সূরা নমল / আয়াত ৮৮**

যার প্রাণ আছে, যার কোষগুলি সজীব তারই একমাত্র চলন ক্ষমতা আছে। কিন্তু পর্বতমালার যে প্রাণ নেই, কোষ নেই এ বিষয়ের মনে হয় সকল সজীব কোষওয়ালা ব্যক্তিই একমত হবেন। আল্লার মতে কিয়ামতের দিন পাহাড় পর্বত সব চলতে শুরু করবে, অবশ্য পর্বতের গতিকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মেঘের প্রাণ নেই বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। অতএব পর্বতমালা মেঘের মত চলমান হবে এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। এমন অবৈজ্ঞানিক আয়াত পরিবেশন করে মানুষকে আরও অজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যে মতবাদ ভুল শেখায় প্রকৃত জ্ঞানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সেটা কখনই মনুষ্যজাতির পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না।

◘ "তিনি রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে পরিণত করেন রাত্রে, তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। প্রত্যেকে এক নির্দিষ্টকাল আবর্তন করে।"

● সূরা ফাত্বির / আয়াত ১৩

রাত দিন হওয়ার ব্যাখ্যাটা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। সে আলোচনায় আর যাচ্ছি না। বর্তমান আয়াতটিতে সব থেকে বেশী আপত্তিজনক হলো সূর্য্যের আবর্তন। কোরাণ বলতে চাইছে সূর্য্য ঘুরছে। সৌরজগত আবিষ্কার হওয়ার আগে কোরাণ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু

'কোরাণ' আল্লার বাণী অতএব বলতে পারি যে কোরাণ বর্ণিত আল্লা সর্বজ্ঞ নন। হয়তো হাজার বছর আগে বক্তব্যটি মানুষ বিশ্বাস করত কিন্তু বিজ্ঞানীদের দ্বারা সত্য উদ্‌ঘাটন হবার পরও এটাকে মেনে নেওয়া যায় কি? তাই অনতিবিলম্বে মোল্লাসাহেবদের আয়াতটিকে উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন নতুবা সত্যমিথ্যার দন্দে কোরাণের প্রতি আনুগত্য বিশ্বাসী বান্দারাই হারিয়ে ফেলবে।

▫ "জাহান্নমীরা ওদের্ ত্বককে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে কেন?' উত্তরে ত্বক বলবে, আল্লাহ্ তিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন।" • সূরা হ্বা-মীম সিজদাহ্ / আয়াত ২১

এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে প্রত্যেককে আল্লা বাকশক্তি দিয়েছেন এটা কি মানা সম্ভব? আবার এ বিষয়ে আল্লার গুণগান গাইছে দেহের চামড়া। একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে এবং তারই একমাত্র ভাষা জানা আছে। অন্যান্য প্রাণী যাদের বাকযন্ত্র বা ভোকাল অরগান আছে তারাই শুধু শব্দ করতে পারে। দেহের চামড়ার এরূপ কিছু আছে কিনা বেহেস্ত থেকে বড় বৈজ্ঞানিক নিয়ে এসে পরীক্ষা করা দরকার।

নারীর মর্যাদা

নারী জগজ্জননী মহামায়ার অংশরূপা, মাতৃবৎ পরদারেষু, নিজের স্ত্রী ছাড়া বিশ্বের সব রমণীই আমার জননী এ শিক্ষা হিন্দু ধর্ম আমাদের দিয়েছে। তবুও কিছু মানুষ ব্যক্তিস্বার্থে নারীকে নিপীড়ন করত, তবে সেটা কখনোই ধর্ম দ্বারা সমর্থিত ছিল না। সতীদাহ বাল্যবিবাহ এগুলোও ছিল প্রথা মাত্রই তা কখনও ধর্ম হয় না। তবু সেই প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। হিন্দু ধর্ম গতিশীল, কখনোই এক বিন্দুতে স্থির থাকে না। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাকে যুগপযোগী করে তোলার জন্য হিন্দু সমাজ বারবার সমাজ সংস্কারক জন্ম নেয়। কোন অন্যায় প্রথাকে আঘাত হেনে সত্যের প্রতিষ্ঠা করলেও কোন সমাজ সংস্কারককে হিন্দু সমাজ কোতল করে না। 'সীতা, সাবিত্রী, সতী' প্রভৃতির মতো আদর্শস্থানীয়া নারী ভারতীয় তথা হিন্দুসমাজেই দেখা গেছে। পাশ্চাত্যে শিক্ষার ছোঁয়ায় হয়তো কিছুটা শিথিলতা দেখা যাচ্ছে তবে তার বিপরীত ছবিও আমরা দেখতে পাই। আমাদের সমাজে একটা স্বামীর একটা স্ত্রী অথবা এক স্ত্রীর এক স্বামী এটাই স্বাভাবিক ও মাধুর্য্যের। বিধবা নারী তার প্রয়াত স্বামীর স্মৃতি বিকে ধারণ করে নির্দ্ধিধায় বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে। হিন্দুসমাজের মেয়েরা স্বামীর অপেক্ষায় উদ্বিগ্নচিত্তে বসে থাকে। এটা সমাজের পবিত্র বন্ধন। স্বামী মাতাল হলেও পতি দেবতা, তাকে ছেড়ে যাওয়া অপরাধ, বরং স্নেহের শাসনে তাকে শুদ্ধ করা উচিত- এ শিক্ষা হিন্দুনারী পেয়েছে। হিন্দু সমাজের পুরুষ স্ত্রীজাতিকে ভোগের বস্তু বলে মনে করে না। মনে করে না সন্তানের ধারক মাত্র। প্রগতির যুগে নারীকে হিন্দু সমাজ ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখেনি। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও নেমেছে কর্মক্ষেত্রে। হিন্দুসমাজ নারীকে দিয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমান অধিকার।

নারীর এই মর্যাদা, স্বাধীনতা, অধিকার কিন্তু মুসলমান সমাজে আমরা দেখতে পাই না। সেখানে তারা ঘরের কোণে, বোরখার আড়ালে চোখের জল ফেলে চলেছে।

ইসলামে নারীকে পুরুষের কামনার বস্তু হিসাবে দেখানো হয়েছে। শরিয়তি আইনের দোহাই দিয়ে পরোক্ষভাবে চলছে নারী নির্যাতন। মাঝে মাঝে কোন শিক্ষিতা আধুনিক নারী তাদের মর্যাদা রক্ষার দাবী তোলে কিন্তু অসহায় নারীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, মোল্লাদের চিৎকারের মধ্যে হারিয়ে যায়। কোন প্রগতিশীল মুসলমান নেতা ওদের স্বপক্ষে একটাও কথা বলে না। বর্তমান প্রতিবেদনে দেখাতে চেয়েছি ইসলামে নারীর স্থান কত নীচে, নারী কত অপাংক্তেয়। কোরাণ ও হাদীস থেকে উদ্ধৃত বাক্যগুলি সেটাই প্রমান করবে।

▫ **"রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। ... অতএব এখন তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার। ..."**

● সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ১৮৭

কোরাণ ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এই তার নমুনা। যে গ্রন্থে সম্ভোগ, সহবাস প্রভৃতি শব্দগুলো বারবার উল্লেখ থাকে সেই গ্রন্থ কি সকলের সামনে পাঠ করা সম্ভব? বহু জায়গায় 'স্ত্রী সম্ভোগের' প্রসঙ্গ তুলে এটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে স্ত্রীজাতি ভোগের 'বস্তু' ছাড়া আর কিছু নয় এবং ইসলাম ধর্মে 'ব্রহ্মচর্য্য' কথাটির যে উল্লেখ পর্যন্ত নেই এটাই তা প্রমান করে। ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয় সংযম ছাড়া কি হৃদয় সংযত হতে পারে, আত্মার উন্নতিসাধন ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব? হিন্দুশাস্ত্র বলে 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা'- ত্যাগই এর প্রথম কথা। হিন্দু ধর্ম শুরু হয় ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের কথা বলে, ইসলাম শুরু হয়েছে 'স্ত্রী সম্ভোগ' ঘোষণার মাধ্যামে। এটা জেনেও যে ব্যক্তি 'সব ধর্ম সমান' বলেন হয় সে নির্বোধ নতুবা অপ্রকৃতিস্থ। আলোচ্য আয়াতের বাক্যাংশ থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয় যে নারী এমনই 'ভোগপণ্য' যাকে সারাদিন পবিত্র রোজা পালনের (উপবাস) পরও ক্লান্ত অবস্থাতেও রেহাই দেওয়া হবে না।

▫ **"এবং অংশীবাদী রমনী যে পর্যন্ত না ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে তোমরা বিবাহ কোরো না।"**

● সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ২২১

আলোচ্য অংশটুকু আয়াতটির প্রথম বাক্য। অংশীবাদী রমণীরা (হিন্দুরা) শ্রদ্ধা ভক্তি পবিত্রতায় বিশ্বাসী তাই ঐ রমণীকে বিয়ে করলে তাকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করা চলবে না তাই খুব চাতুর্যের সঙ্গেই আয়াতটিকে ছুঁড়ে দেওয়া হোলো যাতে অংশীবাদী রমণীকে ভোগের পূর্ণকুম্ভ স্বরূপ মুসলমান ইসলামে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট হয় এবং তখন শরীয়তী আইন প্রয়োগের দ্বারা ভোগের পাশবিক লিপ্সা চরিতার্থ করার পথে কোন বাধা থাকবে না।

▫ **"তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"**

● সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ২২৩

এখানে নারী জাতিকে কত অপমানকর দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে। আমরা নারীকে মাতৃসমা কল্পনা করি ইসলাম সেখানে তাদের শস্যক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করল। শস্যক্ষেত্রকে যেমন যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা যায় তেমনি মুসলমানরাও নারীজাতিকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ ইসলামে নারীর স্বাধীনতা, পবিত্রতা বলতে কিছু নেই। তাই নেই স্বামী স্ত্রীর আজীবন অবিচ্ছেদ্য মধুর সম্পর্কের কথা শুধু আছে তালাকের মহা ঢক্কা নিনাদ যার মাধ্যমে মুসলমান পুরুষ নারীকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করে তার পাশবিক ক্ষুধা মেটাতে পারে। এই সেই সভ্যতা, এই সেই ধর্ম যাকে সযত্নে পালন করে চলেছে দেড়হাজার বছর

ধরে এক গ্রন্থ যার নাম 'কোরাণ'। বর্তমান শতাব্দীতে যেখানে নারীরা সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, অর্বাচীন মুসলমান সমাজ সেই জগজ্জননীর অংশস্বরূপা মাতৃজাতিকে আজও তার মর্যাদা দিতে শিখল না। আজও ঐ সমাজে নারী লাঞ্ছিতা, উপেক্ষিতা; শুধু পুরুষের কামনাতৃপ্তির বস্তু ছাড়া তাদের আর কোন পরিচয় নেই। আমরা হিন্দু হয়েও শুধু মানবিক কারণে ওদের জন্য বেদনাবোধ করি আর মুসলমান সমাজ! নীরব, নির্বিকার। কোন মুসলমান পণ্ডিত বা চিন্তাশীল ব্যাক্তি এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। দু-চারজন সুস্থ চিন্তা করলেও মোল্লা-মৌলবীদের অপচেষ্টায় হারিয়ে যায়। তাই ওদের সমাজে আমাদের মতো একটাও বিদ্যাসাগর রামমোহন তৈরী হোলো না।

▫ "অতঃপর উক্ত স্ত্রীকে যদি সে তালাক দেয় তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। অতঃপর ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় তবে তাদের পূর্ণর্মিলনে কারও কোন দোষ নেই।"

• সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ২৩০

আয়াতটি ভালো করে আলোচনার প্রয়োজন। তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া বৈধ নয়। অন্য পুরুষের সঙ্গে নিকাহ্ করে দাম্পত্যজীবন পালন করার পর যদি দ্বিতীয়জন তালাক দেয় তবেই প্রথম স্বামী বৌকে ফিরে পাবে। হায় রে ধর্ম! নারীজাতির এত অসম্মান! অপর পুরুষ ফেরতা হলে স্ত্রীলোকটি শুদ্ধ হলো এবং তখন তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে আর কোন বাধা রইল না। একটা মুস্কিলও আছে। যদি দ্বিতীয় স্বামী বৌকে তালাক না দেয় তবে প্রথম স্বামী বৌকে আর ফিরে পাবে না। এ আয়াত থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই? স্বামী-স্ত্রীর যে আজীবন অবিচ্ছেদ্য মধুর সম্পর্ক আমাদের সমাজ জীবনে দেখা যায় মুসলমান সমাজে তা একেবারেই অনুপস্থিত। ভালবাসা বলে ওদের কিছু নেই। অন্যান্য প্রানীর মতো পুরুষ নারীর যা সম্পর্ক মুসলমান সমাজে সেটা তার চেয়ে খুব একটা উন্নতমানের নয়। আজ যদি সারা দুনিয়া ইসলামী সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন হয় তবে পবিত্রতা, ভালবাসা, দাম্পত্যজীবনের মধুর সম্পর্ক পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

▫ "আর তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের 'ইদ্দত' (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে তখন তাদের আপন খুশীমত অন্য স্বামী গ্রহন করতে বাধা দিও না। এ তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম।" **• সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ২৩২**

এখানে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আল্লা স্বয়ং অন্য পুরুষ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ এক স্ত্রীর এক স্বামী আজীবন থাকুক তা তিনি চান না। এখানে 'নির্দিষ্ট সময়' বলতে তিন রজঃস্রাবকাল বলা হয়েছে। পুরুষ যখন তালাক দেয় তখন স্ত্রীলোকের কথা ভাবে না। স্ত্রীজাতি প্রকৃতিকভাবেই কোমল হৃদয়ের অধিকারিণী হয়, তাই স্বামীর স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায় না। তবু সে অসহায়। অন্য পুরুষের কামনার শিকার তাকে হতেই হয়। বিধবার ক্ষেত্রেও একই আইন প্রযোজ্য। তাই মুসলমান নারীকে সতীত্ব, পবিত্রতা, এক স্বামীসঙ্গ সুখ নিয়ে বেচে থাকতে দেওয়া হয় না। মহান আল্লার কাছে এক স্বামীকে ছেড়ে অন্যকে গ্রহণ করা শুদ্ধ কাজ পবিত্র কাজ। ইসলাম- ধর্ম বটে।

◘ "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জনের সাক্ষী নেবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের (নারীদের) গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়।" • **সূরা নিসা / আয়াত ১৫**

◘ "আর তোমাদের মতো যে দু'জন ব্যভিচারে লিপ্ত হবে তাদের উভয়কে শাস্তি দেবে যদি তাহা তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয় তবে তাদের রেহাই দেবে।"

• **সূরা নিসা / আয়াত ১৬**

আয়াত দুটি লক্ষনীয়। ব্যভিচার অবশ্যই সামাজিক অপরাধ। নারী বা পুরুষ যেই ব্যভিচার করুক না কেন সেই শাস্তি পাবার যোগ্য, তবে অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে সংশোধন করার সুযোগ দেবার প্রয়োজন আছে। আয়াত দুটিতে দেখা যাচ্ছে যে নারী ব্যভিচারিণী হলে পুরুষদের ভেতর থেকে সাক্ষ্য নিয়ে তাকে মৃত্যু পর্যন্ত যন্ত্রনা দেওয়া হবে, কোন সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে না! অপরদিকে দেখছি, পুরুষ ব্যভিচারী তওবা বা অনুশোচনা করলে তার কোন শাস্তি হচ্ছে না। বিচারে এমন অসঙ্গতি কেন? তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে কোরাণ নারীকে কখনোই স্বাধীনতা দিতে চায় না। তাদের লাঞ্ছনা, যন্ত্রনা দেওয়াই মুসলমান সমাজের কাজ এবং পুরুষ সর্বদাই তাদের তাদের দাবিয়ে রাখবে। নারীর বিচারের সময় কোন নারী সাক্ষী দেওয়ার কথা বলা হলো না কেন? অর্থাৎ নারীর মতামতের গুরুত্ব ইসলামে নেই।

◘ "স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতা আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর।" • **সূরা নিসা / আয়াত ৩৪**

আলোচ্য বাক্যটি আয়াতটির কিয়দংশ। স্ত্রী অবাধ্য হলে তাকে ভালবাসা বা ক্ষমার দ্বারা সংশোধনের কথা বলা হল না। একটা অমানবিক অত্যাচারের নির্দেশ দেওয়া হলো। নারীকে আমারা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখি। আমাদের সমাজের যে সকল অর্বাচীন স্ত্রীদের মারধর করে, সমাজে তারা অতিশয় নিন্দিত। আমদের ইতিহাসে আছে, যারাই নারীর গায়ে হাত তুলেছে তারাই সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ নারী জগজ্জননীর অংশস্বরূপা। এ দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু মুসলমানদের নেই। যদি একান্তই স্ত্রী অবাধ্য হয় তবে আইনতঃ তাকে ত্যাগ করা যেতে পারে কিন্তু বর্তমান সভ্যযুগে, স্ত্রী স্বাধীনতার যুগে (আন্তর্জাতিক নারীবর্ষও অতিবাহিত) নারীদের প্রহার করার নির্দেশ কিভাবে এখনও বলবৎ থাকতে পারে? অর্থাৎ মুসলমান পুরুষ কিছুতেই নারীকে ভোগ্য বস্তুর ঊর্দ্ধে দেবীর আসনে বসাতে পারে না, তাই মুসলমান সমাজে একটাও গার্গী, মৈত্রেয়ী বা সীতা, সাবিত্রী তৈরী হয় না।

◘ "বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না।" • **সূরা মোমেনূন / আয়াত ১, ৫, ৬**

এখানে দুটি আলোচনার বিষয় আছে। প্রথম হলো যৌনাঙ্গ 'সংযত'র কথা বলে আবার নিজ স্ত্রী ও দাসীদের প্রতি যথেচ্ছাচারের কথা বলা হলো অর্থাৎ সংযমের কথাটা বলা প্রহসন মাত্র। ধর্মের প্রথম কথা ব্রহ্মচর্য, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম কিন্তু কোরাণের কোথাও ব্রহ্মচর্যের কথা বলা হয়নি বরং নারীসম্ভোগ নিন্দনীয় নয় এ যুক্তি দেখানো হয়েছে। মুসলমান সমাজে যে ব্যক্তি অবিবাহিত সে সচ্চরিত্র, প্রজ্ঞাবান হলেও নিন্দিত হবে, ধিকৃত

হবে। ওদের মতে অবিবাহিত ব্যক্তির আল্লার দরবারে ঠাঁই হয় না। দ্বিতীয় কথা বিবাহিত পত্নীদের ভোগ করা অপরাধ নয় ঠিকই কিন্তু অধিকারভুক্ত দাসীগণের প্রতি অনুমতি প্রদানের অর্থ কি? অর্থাৎ মুসলমান পুরুষ যদি লড়াই করে নারী লুঠ করতে পারে তবে অবশ্যই তার প্রতি আল্লার ফরমান অনুযায়ী (একাধিক হলেও আপত্তি নেই) জৈবিক ক্ষুধা মেটানো যেতে পারে। ইসলামে একটা নারী কখনোই একটা পুরুষকে এককভাবে পেতে পারে না। একগুচ্ছ পত্নী, একদল দাসীকে একজন পুরুষকে ভাগ করে নিতে হবে। নারীর এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে!

◘ "বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেসব রমণীকে বিবাহ করে বিশ্বাসীদের কোন বিঘ্ন না হয়।" ● সূরা আহ্যাব / আয়াত ৩৭

◘ "আল্লা নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তারজন্য কোন বাধা নেই।"

● সূরা আহ্যাব / আয়াত ৩৮

প্রথম আয়াতটির স্বপক্ষে একটু গোড়ার কথা বলা যাক। মহম্মদের 'যায়েদ' নামক এক পোষ্যপুত্র ছিল। যায়েদের স্ত্রীর নাম ছিল 'জয়নব'। জয়নবের সাথে মহম্মদের একটু 'অবৈধ' সম্পর্ক গড়ে ওঠার বিষয় জানতে পেরে জায়েদ জয়নবকে তালাক দেয়। তখন মহম্মদ তাঁর ধ্যানগুহা থেকে দুদিন ঘুরে ফতেয়া জারী করেন যে 'পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ'। এ বিধান স্বয়ং আল্লার। অতঃপর মহম্মদ জয়নবকে বিবাহ করলেন। এখন কথা হলো, সভ্যসমাজে পোষ্যপুত্রকে আপন পুত্র বলেই মনে করা হয় তাই পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে আপন পুত্রবধূই বলা চলে। মহম্মদ একজন রসুল, একটা ধর্মের প্রবর্তক হয়ে কি করে এমন জঘণ্য অসামাজিক কাজ করলেন। পনেরো বছরের জ্যেষ্ঠা খাদিজাকে বিয়ে করেই তাঁর বিবাহ সম্পর্কিত অসামাজিক কাজ শুরু হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রেও তিনি নজীর সৃষ্টি করলেন। পরবর্তী আয়াতে বলা হল, আল্লা নবীর জন্য এ বিধান দিয়েছেন, তাই নবীর এ কাজ অবৈধ নয়। শিক্ষিত সমাজের কাছে আবেদন, কাজটা বৈধ না অবৈধ আপনারাই বিচার করবেন। আমি শুধু বলব, যে সমাজ পুত্রবধূকেও স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারে সেই সমাজে নারীর পরিচয় মাতা, ভগিনী, বধূ নয়। শুধু একটাই তার পরিচয়- অসংযমী, মুসলমান পুরুষের কামনার তৃপ্তির উপাদান মাত্র।

◘ "কোন বিশ্বাসী নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করবেন এবং নবী তাকে বিবাহ বৈধ করতে চাইলে সেও বৈধ- এ বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়।" ● সূরা আহ্যাব / আয়াত ৫০

পাঠক আলোচ্য আয়াতের অংশটুকু মনোযোগ সহকারে পড়ুন- নবী মহম্মদ যাকে মহাপুরুষ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তাঁর সুবিচারের জন্য আল্লার বিশেষ অনুদান শক্তি নয় জ্ঞান নয়, আত্মদর্শণ নয়, ভোগের চরম বস্তু নারী। বিস্মিত হই, নবীর এতো পত্নীর কি প্রয়োজন ছিল এবং সে কথা কোরাণের আয়াতে স্থান দেওয়ার কি দরকার ছিল! আরও একটা প্রশ্ন থাকে, নবী মহামানব, তাঁকে অনুসরণ করাই বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলমানদের কর্তব্য তবে বর্তমান আয়াতে 'নারী দখলের' ব্যাপারটা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হলো কেন? (যদিও অন্যান্য আয়াতে ঢালাও অর্ডার দেওয়া হয়েছে) একজন ধর্মপ্রবর্তকের জীবনে

এমন কদর্য কাহিনী বড়ই মর্মান্তিক নয় কি? মহাপুরুষের 'অনাসক্ত মনোভাব' মহম্মদের জীবনে দেখা যায় না।

◘ "তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই।" **• সূরা আহ্যাব / আয়াত ৫১**

পূর্বে আয়াতে আমরা দেখেছি কিভাবে আল্লা নবীর নারীপ্রাপ্তির ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছেন। বর্তমান আয়াতে অধিকারটা সংবিধানসম্মত করা হল। মহম্মদ নারীদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারেন, যাকে ইচ্ছা ভোগ করতে পারেন- এটা কোন অপরাধ নয়। হজরত মহম্মদকে একজন মহাপুরুষ জ্ঞানে সবাই শ্রদ্ধা করে কিন্তু মহামানবদের মধ্যে যে কামিনী ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় সংযমের কথা দেখতে পাই তা কি ইসলাম ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদের জীবনে দেখা গেছে? কোরাণ নামক ধর্মগ্রন্থে কেমন করে একজন ধর্মপ্রবর্তকের সম্পর্কে আল্লার বাণী হিসাবে এমন কামক্ষুধার কথা গর্ব ভরে লেখা থাকে। মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ নবী যদি নারীকে এমন কামনার চোখে দেখেন তবে সমস্ত মুসলমান জগত নারী সম্ভোগপ্রিয় হবেই এবং সমাজে নারীজাতি কোনদিন উপযুক্ত মর্য্যাদা পাবে না।

◘ "তারা (স্ত্রীরা) গর্ভধারণ করলে সন্তানপ্রসব পর্য্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দান করে তাদের পারিশ্রমিক দেবে।"

• সূরা ত্বালাক / আয়াত ৬

আলোচ্য আংশটুকু আয়াতটির মধ্যমাংশ। এখানে নারীর মাতৃত্বকে অপমান করা হয়েছে। সন্তানকে স্তন দান করা প্রতিটি প্রাণীর কর্তব্য। শুধু মানুষ নয় নীচ, হিংস্র বন্যপ্রাণীও এ কর্তব্য করে থাকে। তবে 'যদি' শব্দটা ব্যবহার করে নারীর মাতৃত্ববোধকে অপমানিত করা হল না কি? প্রত্যেক মা তার সদ্যোজাত সন্তানকে আপনার ইচ্ছামত স্তনদান করে থাকে। স্ত্রী স্বামীর অধীনে নিশ্চয় কর্মচারীর কাজ করে না যার জন্য তাকে 'পারিশ্রমিক' নিতে হবে। পারিশ্রমিক কথাটার উল্লেখ করে ইসলাম গোটা মাতৃজাতিকে অপমান করেছে। অর্থাৎ নারী 'মা' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক এটা তারা চায় না, কারণ নারী তাদের কাছে ভোগের উপাদান, সন্তান উৎপাদনকারী যন্ত্র মাত্র। দুঃখের বিষয়, এই অবহেলিত, উপেক্ষিত মুসলমান নারীদের কথা কোন প্রগতিশীলন সংস্কারপন্থী 'মহিলা সমাজ' ও ভাবে না।

◘ "যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে সম্ভবত তাকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ঠতর স্ত্রী যারা হবে অকুমারী এবং কুমারী।"

• সূরা তাহ্বরীম / আয়াত ৫

কোরাণের এই আয়াতটি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। এখানে নবী মহম্মদের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায় এবং একই সঙ্গে নারী যে ইসলামের কত অবহেলার বস্তু তারও ইঙ্গিত দেয়। মহম্মদ যদি তাঁর সকল বিবিকেই পরিত্যাগ করেন তবে আল্লা তার বিনিময়ে তাঁকে কোন জ্ঞান নয়, মুক্তি নয়, স্বর্গ নয়, স্ত্রীর বদলে দেবেন উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। অর্থাৎ নবীর আবার একগুচ্ছ বিবি আমদানির প্রশস্ত হোলো। মহামানব মহম্মদ নারীর প্রতি

কতটা অনুরক্ত তা সহজেই অনুমেয় এবং নারীজগৎকে নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কোন পরিচয়ে দেখতে পান না এ সন্ধানও পাওয়া গেল। আবার বলা হলো কুমারী এবং অকুমারী অর্থাৎ গৃহস্থ বধূও হবে রসুলের ভোগের বস্তু। এই একজন মহাপুরুষের নৈতিক পরিচয়, আর এই কথা আল্লার বাণী কোরাণ শরীফে লেখা হলো। বিস্মিত হই কোন মুসলমান নারী তাদের দীনতার দুঃখে গর্জে ওঠে না। স্বয়ং রসুল তাদের কামনার উপাদান ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না এ ভেবেও কোন মুসলমান নারী বিদ্রোহী হয় না।

◘ "তারপর রমণীদের সম্পর্কে বললেন "আল্লাকে ভয় কর, নিশ্চয় তোমরা তাদের জামিনে গ্রহণ করেছ এবং আল্লার বাণী দ্বারা দেহকে তোমাদের জন্য বৈধ করেছ।"

• হাদীস ৬২৫ / বিদায় হজ্ব

বাক্যটির আলোচ্য হাদিসের কিয়দংশ। মহম্মদ সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই বানীটি প্রদান করেছিলেন। বিস্মিত হই, জনতার প্রতি পবিত্র মাস, পবিত্র দিন পবিত্র শহরের কথা বলতে বলতে রমণী প্রসঙ্গ না আনলে কি চলছিল না! ইসলামের মতে নারীকে জামিনে গ্রহণ করা হয়। পবিত্র সামাজিক নিয়মের মাধ্যমে ভালবাসার চিরস্থায়ী বন্ধনের উদ্দেশ্যে নয়। আল্লার বাণী নিয়ে রমণীর শুধু দেহই বৈধ হল। নারীর সঙ্গে পুরুষের কি এইটুকুই সম্পর্ক থাকবে? নারী কি পুরুষের কাছে 'দেহ' ছাড়া আর কিছু হবে না? কোন মুসলমান এই হাদীস পাঠ করার পর জেনে যাবে যে নারী দেহ যদি ভোগ করা না হয় তবে আল্লার বাণীকে অস্বীকার করা হলো অর্থাৎ হে আল্লার একনিষ্ঠ বান্দা প্রেমসে নারীদেহ ভোগ করে যাও। এ তোমার বৈধ কাজ। আর হায়রে মুসলমান সমাজের লাঞ্ছিতা নারী, হিন্দু সমাজ যাকে জগজ্জননীর অংশস্বরূপা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে, যে নারীকে পুরুষের শক্তিরূপে আখ্যা দেওয়া হয়, যার স্নেহমমতাস্পর্শে সংসার কল্যাণময় হয়ে ওঠে, ইসলাম সেই নারীকে শুধু স্থূল দেহরূপে পুরুষের কাছে তুলে দিচ্ছে। বিশ্বনবী, আল্লার রসুল মহান বাণীর মাধ্যমে নারীকে পুরুষের ভোগ করার অধিকার আরও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে গেলেন।

বেহেশত্ - দোজখ

স্বর্গ ও নরককে ইসলামের ভাষায় যথাক্রমে বেহেশত ও দোজখ বলা হয়। মানবজীবনে যে ব্যাক্তি অন্যায়, অসৎ ও অধর্ম পথে চলবে তারই হবে নরকবাস। আর সৎ, সরল, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রই স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারবে এই বিশ্বাস আমাদের। আমরা মনেকরি না হিন্দুমাত্রই স্বর্গবাসী হবে আর অহিন্দু অবশ্যই নরক গুলজার করবে। হিন্দুধর্ম প্রকৃত মানব ধর্ম। তাই অধার্মিক, মানববিদ্বেষী অসৎ হিন্দুকে যেমন নরকবাসী হতে হবে তেমনি কোন মানবতায় বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ অহিন্দুও স্বর্গলাভ করতে পারবে। ইসলামে কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। যারা আল্লার নিষ্ঠাবান বান্দা ও কোরাণের প্রত্যেকটি বাণীই মেনে চলে, অমুসলমানকে কোতল করে, অবশ্যই একগন্ডা বিয়ে করে বরাহের ন্যায় সন্তান পয়দা করে- সেই বিশ্বাসী মুসলমানই একমাত্র 'বেহেশত' লাভ করবে। অপরপক্ষে অমুসলমান মূর্তিপূজক (যতোই তারা নিষ্ঠাবান সৎ ব্যক্তি হোক) মাত্রই 'দোজখে' ঠাঁই পাবে। স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, ইসলামে কিন্তু তা নয়। আমরা মনে করি স্বর্গ হচ্ছে এক মহাপবিত্র স্থান যেখানে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটবে। সকল আসক্তির বাঁধন ছিঁড়ে, কামনা

বাসনার অনেক উর্দ্ধে যে দেবত্বভাবের অনুভূতি তাই স্বর্গ। কিন্তু কোরাণে বর্ণিত স্বর্গ আলাদা। সেখানে কোন মহত্ত্ব, দেবত্ব নয়, নারী ও সুরার এক আনন্দবাজার। অর্থাৎ যারা কোরাণসম্মত মুসলমান তারা যদি সারাজীবন আল্লা ও তাঁর রসুলের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য রাখে তবে অবশ্যই বেহেশতে চিরস্থায়ী নারীসম্ভোগের পরমতৃপ্তি লাভ করবে।

নিম্নোক্ত আয়াতগুলো থেকে ইসলামের স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে।

▫ "যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে তাদের জন্য রয়েছে স্বর্গ সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে অধিকন্তু তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।"

● সূরা বাকারাহ্ / আয়াত ২৫

ইহজীবনে সৎভাবে ও সৎকাজে জীবন কাটালে মানবজাতির স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এবং এই স্বর্গ বলতে আমরা বুঝি মায়া বা ভোগের বিপরীত অবস্থা যা শুধু অপার শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে এবং আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবে অর্থাৎ দেবত্বপ্রাপ্ত হবে। স্বর্গ সম্বন্ধে ভারতীয় সমাজ তথা হিন্দু সমাজের এটাই স্পষ্ট ধারণা, কিন্তু ইসলামে স্বর্গ একটু অন্য প্রকৃতির। এই স্বর্গে ঈশ্বর নয়, আত্মার মুক্তি নয়, ভোগের সমাপ্তি নয়। এখানে সেই সঙ্গিনী অর্থাৎ নারী। ইসলাম ইহজীবনেই নারীভোগের কথা বলে শেষ করেনি, স্বর্গেও এই ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে যাতে কামলোভী ব্যক্তি স্বর্গে নারীর সঙ্গসুখ লাভার্থে ইসলামের দারস্থ হয়। 'অধিকন্ত তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে'– অর্থাৎ বেহেশতবাসী চিরকালের জন্য সঙ্গিনী পেয়ে যাবে। এ ধরণের সঙ্গিনী পাওয়ার গ্যারান্টি আর কোন ধর্ম দিতে পারে কি?

▫ "নারী, সন্তান, সোনা ও রূপার ভাণ্ডার এবং পছন্দসই ঘোড়া ও চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু! বলো আমি কি তোমাদের এ সব বস্তু হতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা সাবধান হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লার সৃষ্টি রয়েছে।"

● সূরা আল-ই-ইমরান / আয়াত ১৪-১৫

ইহজীবনে ভোগের কথা, পরলোকেও ভেগের বর্ণনা। আধ্যাত্মিকতা বলতে কিছু নেই, আল্লা ইহজীবনে মানুষকে মায়াবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য নারী সোনা, রূপা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর অপর আকৃষ্ট করে রেখেছেন। শুধু তাই নয় পরলোকেও ভোগের উপাদান মজুত করে মানুষকে চিরস্থায়ীভাবে কামলোভ প্রভৃতির মায়াজালে আকৃষ্ট করে রেখেছেন। একটা কথাই এখানে পরিষ্কার হয় যে ইসলাম কখনোই মানুষের মুক্তির কথা বলতে পারে না। কখনোই আধ্যাত্মিকতার পবিত্রতায় মানুষকে তার স্বরূপ জানতে শেখায় না।

সমগ্র কোরাণের মধ্যে এত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বেহেশতে নারীর সন্ধান দেওয়া আছে তা সংকলন করলে 'বেহেশত্' পুস্তিকা হয়ে যেতে পারে। বেহেশতে 'হুরী'রা কেমন দেখতে হবে, কেমন অবস্থায় থাকবে- এই প্রসঙ্গে কোরাণ থেকে কিছু আয়াত তুলে ধরা হল।

▫ "আর যারা বিশ্বাস করেও ভাল কাজ করে তাদের স্বর্গে প্রবেশ করার যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে এবং তাদের চিরস্নিগ্ধছায়ায় স্থান দান করব।" **● সূরা নিসা / আয়াত ৪৭**

◘ "তারা এবং তাদের সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে।" • সূরা ইয়াসীন / আয়াত ৫৬

◘ "তাদের সঙ্গে থাকবে লজ্জানম্র আয়াতলোচনা তন্বীগণ।"

• সূরা আফ্‌ফাত / আয়াত ৪৮

◘ "এবং তাদের পার্শ্বে থাকবে আয়তনয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ।"

• সূরা স্বোয়াদ / আয়াত ৫২

◘ "আয়াতলোচনা হুর (স্বর্গীয় নারী) দেব।"

• সূরা দোখান / আয়াত ৫৩

◘ "তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে। আমি তাদের মিলন ঘটাব আয়াতলোচনা হুরের সঙ্গে।" • সূরা তূর / আয়াত ২০

◘ "সেখানে থাকবে আয়াতনয়না তরুণীগণ, যাদের পুর্বে মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।"

• সূরা রাহমান / আয়াত ৫৬

◘ "প্রবাল ও পদ্মরাগসদৃশ এ সকল তরুণী।"

• সূরা রাহমান / আয়াত ৫৮

◘ "তাদের বক্ষদেশ বর্তুল, সমান্তরাল এবং অনম্র।"

• হাদীস / স্বর্গের নারীরা, জামে তিরমিজি

◘ "সেখানে থাকবে সুশীলা সুন্দরী রমণীগণ।"

• সূরা রাহমান / আয়াত ৭০

◘ "সুলোচনা ও তাঁবুতে অবস্থানকারিনী এ সকল রমণী।"

• সূরা রাহমান / আয়াত ৭২

◘ "ওরা সুন্দর গালিচা বিছানো সবুজ চাদরের ওপর হেলান দিয়ে বসবে।"

• সূরা রাহমান / আয়াত ৭৬

◘ "পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপুর্ণ পেয়ালা (বাটি) নিয়ে।"

• সূরা ওয়াকিয়াহ্‌ / আয়াত ১৮

◘ "সেখানে তাদের জন্য থাকবে আয়াতলোচনা হুরী, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ, তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ।" • সূরা ওয়াকিয়াহ্‌ / আয়াত ২২-২৪

◘ "তাদের জন্য থাকবে সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী, ওদের আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে- ওদের করেছি চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।"

• সূরা ওয়াকিয়াহ্‌/ আয়াত ৩৪-৩৭

◘ "সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র।"

• সূরা নাবা/ আয়াত ৩৩-৩৪

◘ "হরিণনয়না স্বর্গসুন্দরীগণ তাদের পত্নী হবে তারা সবাই (৩৩-৩৪ বছরের পুর্ণ যৌবনপ্রাপ্তা) সমবয়স্কা হবে।" • হাদীস / ৭০৩ (বেহেশত্‌ - দোজখ)

উপরে বেহেশত সম্পর্কিত কোরাণের কিছু আয়াত ও হাদীস থেকে এটাই বোঝা যায় যে ইসলামে বর্ণিত বেহেশত্‌ একটি 'গণিকালয়' ছাড়া আর কিছুই নয়। বেহেশত সুন্দরী উদ্ভিন্ন যৌবনা নারীর কথা এত বিস্তারিতভাবে বার বার বলা হল কেন? চিন্তাশীল

পাঠক মাত্রেরই বুঝতে অসুবিধা হবে না যে রক্তমাংসে গড়া মায়াবদ্ধ মানুষকে সহজে ইসলামী পতাকার তলায় আনার জন্য এমন নগ্নভাবে ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকৃত একটি পুস্তকে বারবার বেহেশতে নারীর টোপ রাখা হয়েছে। একজন কামুক ব্যক্তি যখন কোরাণ পাঠ করবে স্বভাবতই তার বেহেশতের ঐ চিরস্থায়ী যুবতী লাভের জন্য মনটা উদগ্রীব হয়ে উঠবে এবং যেহেতু কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী একমাত্র বিশ্বাসী মুসলমানই বেহেস্তের অধিকারি হতে পারে তাই সে ব্যক্তি আজীবন নিষ্ঠা সহকারে মুসলমান হয়ে থাকবে তবুও ব্রহ্মচর্য্যহীন, ধর্ম-শূন্য ইসলামের বিরুদ্ধে একবারের জন্যও প্রতিবাদ করবে না। এক ধরনের অজ্ঞতা ও অন্ধত্ব তাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

'স্বোয়াদ' সুরার ৫২ নং আয়াতে এবং হাদীসটিতে সমবয়স্কা তরুণীদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ শিশুকাল কি যৌবনকালে অথবা বৃদ্ধকালে যে অবস্থাতেই মৃত্যু হোক না কেন কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই ৩৩/৩৪ বছরের পূর্ণ যুবক হয়ে মাটির তলা থেকে উঠে 'বেহেশতে' যাবে। প্রশ্ন হল 'সমবয়স্কা তরুণী' কথা বলার অর্থ কি? কোন বৃদ্ধ যদি সারাজীবন নিষ্ঠাবান মুসলমান থাকার পর বেহেশতের কথা ভাবে তবে সে অবশ্যই দীর্ঘশ্বাস ফেলবে এই ভেবে যে বৃদ্ধ অবস্থায় বেহেশতে তার ঘুমানো ছাড়া আর কোন কাজ থাকবে না। তাই বেহেশতের শুভ সংবাদ পরিবেশন করে বলা হলো যে পুরুষরা যুবক অবস্থাপ্রাপ্ত হবে এবং সেখানে রাশি রাশি চিরকুমারী সুরাপাত্র হাতে হাজির থাকবে। ইসলামে 'সুরাপান' নিষিদ্ধ কিন্তু বেহেশতে সুরাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সুরা 'ওয়াকিয়াহ্' আয়াত ২২/২৪ এ বলা হয়েছে যে আল্লা বিশ্বাসীদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ বেহেশতে তাদের আয়তলোচনা সুন্দরী তন্বীর ব্যবস্থা করেছেন। বড় বিস্ময় লাগে যখন ভাবি, পৃথিবীর সভ্য সমাজ কি করে ইসলামকে ধর্ম বলে স্বীকৃতি দেয়। কি করে আল্লাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সাদৃশ্য করে। সর্বধর্ম সমন্বয়কারীদের কাছে প্রশ্ন রাখি যে, এই ধরণের বেহেশত পেতে তারা আছেন কি না? বিজ্ঞের দৃষ্টিতে কোরাণ পাঠ করার পরও 'ইসলাম একটি ধর্ম' বলতে রাজী আছেন কিনা? যে ধর্মের শেষ হয় যৌন সম্পর্কের চিরস্থায়ী তৃপ্তির ইঙ্গিতে তাকে এই বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল যুগে কি মানুষের ধর্ম বলা যাবে? যে পরামর্শ, যে নির্দেশ মানুষকে শুধু পশুর মতো যৌন প্রবৃত্তির মধ্যে সৃষ্টির সমাপ্তি ঘটাতে চায় তা যদি পৃথিবীর মানুষ গ্রহণ করে তবে যে মানসিকতা সমাজে সৃষ্টি হবে তা কি কোনোমতে মনুষ্যগোষ্ঠীর কাছে কল্যাণকর? ভন্ডামী ত্যাগ করে যদি স্পষ্টভাবে জোরালো কন্ঠে কেউ বলতে পারে তবে এ কথাই সে বলবে যে ইসলাম যদি দুনিয়াকে গ্রাস করে তবে মনুষ্য সমাজ চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। আবার অসভ্য বর্বরতার যুগে আমাদের ফিরে যেতে হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আগেই বলা হয়েছে, ধর্ম-সত্য-ন্যায় বিচ্যুত মানুষ মাত্রই নরকবাস করবে। সে- যে ধর্মেরই হোক না কেন। এটা আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইসলাম ধর্মে অমুসলমানমাত্রই 'দোজখ'বাসী। কোরাণে দোজখের ভয়ংকর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অবিশ্বাসী সীমালঙ্ঘনকারী মূর্তিপূজায় অনুগত (অত্যাধিক ধার্মিক ব্যক্তিকেও) দোজখের এমন ভয় দেখানো হয়েছে যাতে, সরল সাধারণ মানুষ ইসলামে অনুগত হয়। দোজখ বা নরক সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত নীচে দেওয়া হলো।

▫ "যে আল্লা ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" • সূরা নিসা/ আয়াত ১৪

▫ "যারা আমার আয়াতকে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে।"

• সূরা নিসা/ আয়াত ৫৬

▫ "যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক, তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যাতে ওদের চামড়া এবং ওদের উদরে যা আছে তা গলে যাবে এবং ওদের জন্য থাকবে লৌহ মুদ্গর, যখনই ওরা যন্ত্রনায় কাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই ওদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে ওতে।"

• সূরা হজ্ব/ আয়াত ১৯-২২

▫ "আমি সীমালঙ্ঘঙ্কারীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি, যার বেষ্টনী ওদের পরিবেষ্টন করে থাকবে। ওরা পানীয় চাইলে ওদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা ওদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে; কি ভীষণ সে পানীয় আর নিকৃষ্ঠ তাদের অগ্নিময় আরামের স্থান!"

• সূরা কাহাফ/ আয়াত ২৯

▫ "যদি দোজখের এক বালতি গলিত রক্ত ও পুঁজ পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হতো তবে পৃথিবীর কেহই তার দুর্গন্ধে বেঁচে থাকতে পারত না। যদি সে কন্টকময় বিষাক্ত খাদ্যের বিন্দুমাত্র পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হতো তবে কাউকে আর জীবিকা অর্জনের জন্য বিবাদ বিসংবাদ করতে হতো না (কারণ তা খেলে কেউ বাঁচত না)।" • হাদীস ৭১১-৭১২/ বেহেশত্-দোজখ

অতএব সাবধানী বিচক্ষন পাঠক সভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের জন্য এই অপশক্তির বিরুদ্ধে পবিত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন।

"এ বিষয়ে মুসলমানরা অত্যন্ত স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। তাদের সিদ্ধবাক্য শুধু একটিই, 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ মহম্মদুর রসুলুল্লাহ'। অর্থাৎ ঈশ্বর মাত্র একজনই এবং মহম্মদ তার রসুল(প্রতিনিধি)। এই সিদ্ধ বাক্যের বাইরে আর যা কিছু আছে সবই নিকৃষ্ট বস্তু এবং অবিলম্বে সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে – এই হল মুসলমানদের কথা। এ কথায় যে বিশ্বাস করে না, সে পুরূষই হোক কিংবা নারীই হোক, মুহূর্তের হুঁশিয়ারি দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে; যা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্গত নয় তাকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করতে হবে এবং এই বিশ্বাসের সাথে মিলছে না এমন যত গ্রন্থ আছে সেগুলিকে দগ্ধ করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে শুরু করে অতলান্তিক মহাসাগর পর্যন্ত পাঁচশত বর্ষব্যাপী পৃথিবীর বুকে এই এক কারণে রক্তের বন্যা বয়ে গিয়েছে। এই হল ইসলাম।"

-**স্বামী বিবেকানন্দ** (বিবেকানন্দ রচনাবলী, অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত, মায়াবতী সংস্করণ, চতুর্থ খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)

"যদি কেউ যুক্তির ধার না ধারে তবে সুবিচার পাওয়া যায় না। এটা ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্যি। কোন ধর্ম অত্যন্ত ভয়ানক নির্দেশ প্রদান করে। যেমন, ইসলাম মুসলমানদের তাদের ধর্মের অন্তর্ভূক্ত নয় এমন সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। কোরানে এটা পরিষ্কার বলা আছে, 'অবিশ্বাসীদের খুন কর যদি তারা মুসলমান না হয়।' তাদের আগুন ও তরবারির দ্বারা হত্যা কর।"

-**স্বামী বিবেকানন্দ**(প্রাকটিকালবেদান্ত, পৃষ্ঠা৭২, অদ্বৈতআশ্রমপ্রকাশিত, ২০০২)

"যে ঈশ্বর (আল্লা) নিজের ধর্মের লোকদের পক্ষপাতিত্ব করে মানুষ বলে এবং অন্যদের নিষ্ঠুরভাবে ঘৃণ্য পশু বলে গণ্য করে, সে একজন শয়তানের থেকেও অধম।এই রূপ ঈশ্বরকে উপাসনা করার থেকে বরং আমি একশোবার মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। আমি সারাজীবন এই ঈশ্বরের বিরূদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।"

-**স্বামী বিবেকানন্দ**(প্রাকটিকালবেদান্ত, পৃষ্ঠা১৫, অদ্বৈতআশ্রমপ্রকাশিত, ২০০২)

"জিহাদ হল, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত রকম বর্বরতার অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে বর্বরতম ও সর্বাপেক্ষা পাশবিক হত্যালীলা। তিনটি ইংরাজী শব্দের মাধ্যমে জিহাদের বর্বরতাকে প্রকাশ করতে সুবিধা হয়, তাহল by sword, fire and rape বা তরবারী, আগুন ও ধর্ষণের মধ্য দিয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা নির্বিশেষে কাফের হত্যা করে তাদের সহায়, সম্বল, ধন-দৌলত লুটপাট করে তাদের জায়গা দখল করার নামই জিহাদ।"

-**ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী**(ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত, পৃষ্ঠা-৭)

“Islamic terrorism is inspired by Islamic teachings. We can never get rid of Islamic terrorism unless we defeat the ideology behind it and that is Islam itself. Islam induces hate backed by lies. Muhammad was a terrorist by his own admission. All Muslims, to the extent that they follow him, are terrorists. Those Muslims who are not terrorists are ignorant of Islam and are not good Muslims. Fortunately they are the majority. We need to rescue them. If you are a good human being, you are not a Muslim. Read this site and if you can't prove me wrong, which you certainly can't, leave this deceitful cult of hate and terror and join mankind. Don't be part of the Umma. Umma is fascism. It is divisive. It induces the hatred of others. Be part of humanity instead. Your ignorance is not an excuse. Pull your head out of the sand and face the truth, like we did.”

-Ali Sina (About Faith Freedom International, www.faithfreedom.org)

“কোরাণ ও ইসলামের তরবারী মানবসভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের সবচেয়ে বড়ো শত্রু, যা আজ পর্যন্ত মানুষ দেখেছে।”

-স্যার উইলিয়াম ম্যূর (দ্য লাইফ অফ মহম্মদ, ভয়েস অফ ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৫২২)

“ইসলাম এমন একটা ধর্মবিশ্বাস যা সমস্ত মানবজাতিকে দুটি চির বিবদমান জাতিগোষ্ঠীতে ভাগ করে দিয়েছে। একদল যারা আল্লার দল অর্থাৎ মুসলমানরা; আরেক দল হল শয়তানের দল অর্থাৎ সব অমুসলমানরা। অমুসলমানদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাটা ইসলামে এতই জরুরী যে ইসলাম তার অনুগামীদের অর্থাৎ মুসলমানদের এর জন্য অমুসলমানদের হত্যা, লুন্ঠন ও অমুসলমান নারী অপহরণকেই সর্বাপেক্ষা বড় ধর্মীয় কর্তব্য বলে শিখিয়েছে; এসবই ইসলামে ‘জেহাদ’ নামে পরিচিত এবং এসব কুকর্ম করেই কেবল মুসলমানরা স্বর্গে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারে।”

-আনোয়ার শেখ (ইসলাম অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস, লন্ডন, পৃষ্ঠা-৩৭)

“ইসলাম কোন ধর্ম নয়, ইসলাম হচ্ছে আরব সাম্রাজ্যবাদ।”

-আনোয়ার শেখ (ইসলাম, আরব সাম্রাজ্যবাদ, পৃষ্ঠা ৫, Also see www.faithfreedom.org)